

বিদেশে-পথে-প্রান্তরে

[আমেরিকা এবং ক্যানেডা-ভ্রমণ বৃত্তান্ত]

বিদ্যাসাগর প্রকাশন
২৩/১ কলেজ রো
কলকাতা-৯

● প্রকাশক : এম. দত্ত
১৪৮ বি. এম. ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-৫৬

● প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী : সুনির্মল পুরকায়স্থ
● প্রথম প্রকাশ : ২৯শে বৈশাখ
বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৪৯

● মুদ্রাকর : শ্রী দুকড়ি দাস
গোপীনাথ আর্ট প্রেস
১১, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট
কলকাতা-১২



শ্রীমা

মুখবন্ধ

না-না, বিশ্বাস করুন,—কারো মুখ আমি বন্ধ করতে চাই না। বাক স্বাধীনতাই ত আমাদের একমাত্র স্বাধীনতা। আমার লেখনীর মুখ বন্ধ করার এটা একটা ভূমিকা মাত্র।

ভ্রমণ কাহিনী লেখার ইচ্ছা থেকে নয়,—পণ্ডীচেরী আশ্রম নিবাসী আমার সুহৃদ মুরারি মোহন ভট্টাচার্য্যকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখার সঙ্কল্প থেকেই এর আরম্ভ। তাছাড়া এটা দ্বন্দ্ব সমাস নয়,—ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস মাত্র,—ভ্রমণ ও কাহিনী কদাপি নয়—ভ্রমণের কাহিনী মাত্র। যেখানে যেখানে গিয়েছি তার ইতিহাস, কিম্বদন্তী ইত্যাদি এবং বিভিন্ন মিউজিয়ামে দেখা বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্করদের শিল্পকলার খানিকটা পরিচয় বন্ধুবরের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যাদির সঙ্গে পরিবেশন করেছি। বর্তমান পুস্তকটি সেই পত্রেরই বন্ধুবরের নির্দ্দেশে করা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপ।

যাঁদের আগ্রহ ছাড়া এ ভ্রমণ ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত আদৌ সম্ভব ছিলনা—বিশেষতঃ যে দুইজন স্নেহভাজন-অধ্যাপক ডঃ মিলন দত্ত ও অধ্যাপিকা বাসন্তী চাকী-যারা পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করেছেন—তাদের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। গ্রন্থে বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল বলে ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধন করা হবে।

সর্বশেষে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফলাফল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার চরণে সমর্পণ করে ভার মুক্ত হলাম।

সুনির্মল পুরকায়স্থ

৮/১০ পোলক এ্যাভিন্যু,
দমদম, কলকাতা-৮০

[আমেরিকার পথে—কোলকাতা—বোম্বাই—দুবাই—লণ্ডন]

মিনিয়াপোলিস,

বন্ধুবরেষু,

আজ থেকে যুগ পাঁচেক আগে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পোলাও কালিয়া দধি সন্দেশের অঢেল ব্যবস্থা থাকলেও শুরু করা হত সুক্তো দিয়ে। প্রাচীনপন্থীদের মত আমিও প্রাক্তন পদ্ধতি অনুসরণ করে আটচল্লিশ ঘণ্টার বিরস বিমান বিহার থেকেই শুরু করছি, —যদিও দধি সন্দেশ দিয়ে শেষ রক্ষা করতে পারব কিনা জানি না।

এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে ভাগ্যক্রমে খুব ভাল জায়গাই জুটে গেল। গবাক্ষে গৃহিনী; পাশে স্টীমারের পেছনে গাটা বোটের মত আমি, সামনে পা দুটো অবাধে সটান করার অঢেল জায়গা। সুখ নিদ্রার অসুবিধা ছিল না, তবুও—

'রাত কাটে গিনগিনকে তারে'।

তবে গুনবার মত তারাই বা কোথায়। তারা ত মেঘ সমুদ্রে হারা। ঘণ্টা দুই বৃথা চেষ্টা করা গেল। ইতিমধ্যে বোম্বাই বিমান বন্দরে বিমান অবতরণ করল।

গৃহিনী বল্লেন—"চল, নেমে একটু পায়চারি করে নিই"।

কী আর দেখব। দোকান পাট আর নিদ্রালু নরনারী। কিছুটা পদচারণে, কিছুটা গালগল্পে ঘণ্টা আড়াই কাটিয়ে আবার এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে উঠে বসা গেল।

অপ্রসন্ন আকাশের মুখ ভার, ভোরের আলো ফুটতে তখনো ঢের দেরী। তা হলে ভারতের মাটি ছেড়ে এবার সত্যই চল্লাম। আরব সাগরের জলরাশি এখনো আঁধারে অদৃশ্য। আমাদের বিমান থামবে আরব সাগর পার হয়ে আরবের মরু প্রান্তে, দুবাই বিমান বন্দরে। এর আদরের নাম "পারস্য উপসাগরের মুক্তা"।

আমরা যখন ডুবাই এর কাছাকাছি এলাম তখন ভোরের আলো সবে ফুটে উঠেছে। প্রভাতের নরম আলোয় চোখের সামনে ভেসে উঠল—আরবের বালুকা সমুদ্রের স্থির তরঙ্গ। এখানে ওখানে দু'চারটি সাদা গম্বুজওয়ালা বাড়ী আর চতুর্দিকে ঢেউ খেলান প্রান্তরে কণ্টক সর্বস্ব তৃণের কঠিন জীবন সংগ্রাম। এই রুক্ষ নিঃসঙ্গ নির্জ্জন তৃণগুল্মহীন দিগন্ত প্রসারিত বালুকাময় প্রান্তরেরও একটা নিজস্ব বিশেষ রূপ রয়েছে। সে সৌন্দর্য অতি প্রকট নয়; তাকে দরদ দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়।

"সোনার তরুয়া বন্ধু! একবার দেখ,
আমার নয়ন নিয়া তুমি তারে দেখ"।

আর মরুর দুই প্রান্তের দুই শহর—করাচী ও যোধপুরে প্রথম যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছি বলে এ দৃশ্য আমার কাছে পুরানো বন্ধুর মত পরিচিত ও প্রিয়।

ডুবাইএ বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীরা নামবার জন্য অস্থির। তা বলে ভেবো না এটাই তাদের গন্তব্য স্থল। শুল্ক নেই বলে স্বল্প মূল্যে জিনিষপত্র কেনাকাটার ঝোঁকেই এদের দ্রুতাবতরণ। বিমান সেবিকা (এয়ার হোস্টেস) স্মরণ করিয়ে দিলেন যেন 'পাসপোর্ট' সঙ্গে নিয়ে নামি এবং বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসি; কারণ হাওয়াই জাহাজ এখানে খুব অল্প সময়ের জন্যই থামে।

গৃহিণী বল্লেন, 'সুযোগ যখন পেলামই তখন চলনা আরবদেশের মাটি—থুড়ি—বালুকা স্পর্শ করেই আসি"।

বল্লাম, 'তথাস্তু, চল দেখেই আসা যাক্'।

বিমান বন্দর হোক না ছোট.—তবুও ছিমছাম, সুন্দর। স্থানীয় স্থাপ[illegible] সঙ্গ পাশ্চমা ঢংএর মিতালী। বহুশ্রম ও অর্থের বিনিয়োগে ছোট ছ[illegible]ট ফুলের বাগান, গাছ, লতাপাতা,—অন্যত্র অসামান্য না হ[illegible] এখানে সত্যই সার্থক ও অসামান্য বিমানবন্দরের কর্মীদের মধ্যে [illegible] ভারতীয় বলে মনে হল। মহিলা কর্মীর সংখ্যাও

খুব নগণ্য নয়। তবে তাঁরা সবাই কৃষ্ণাঙ্গিনী ও মনে হয় প্রান্তবর্ত্তী মধ্যদেশিনী।

প্রশ্ন আমাদের কেনার নয়—চেনার। সেটা সামান্য বিশ মিনিটে কদাপি সম্ভব নয়। অতৃপ্ত অন্তরে অচিরে অপেক্ষমান বিমান গর্ভে পুনঃ প্রবিষ্ট হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সগর্জ্জনে বিমান ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। এবার সুপার (Super) হনুমানের মত এক বিরাট উচ্চ তথা দীর্ঘ লম্ফনে বিমানটি লণ্ডন বিমান বন্দরে উপনীত হবে। 'পিপাসিত' আঁখি বিমান গবাক্ষে নিবদ্ধ রইল।

আরবের আকাশ ছিল নির্মেঘ,—রৌদ্রস্নাত। আমরা যাচ্ছিলাম প্রায় তেত্রিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে। আরব ভূখণ্ড পার হতে না হতেই নিম্নে আকাশে আবার মেঘের ভিড়, যদিও তা নিচ্ছিদ্র নয়। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল—একদিকে প্রসারিত নীল সমুদ্র,—অন্যদিকে অসমতল বালুকাময় প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে রুক্ষ বাদামী পাহাড়ের শ্রেণী। মনে মনে পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ ইয়োরোপের মানচিত্রটা অনুধাবনের চেষ্টায় ছিলাম। আল্পস পর্ব্বত দর্শনের একটা গোপন বাসনা মনে মনে পোষণ করছিলাম, কিন্তু সেটা হল কি হল না—

"সে কি এল! সে কি এল না!" বোঝাই গেলনা।

মেঘের কবাট যেন আমার ভাগ্যেরই মত, খুলতেই চায়না। কখনো অল্পস্বল্প খুললে দেখতে পাচ্ছিলাম—নীচে পাহাড়ের শ্রেণী,—যেন কিছুটা মণ্ডলাকৃতি, ঘরোয়া ধরনের। সে ত ছবিতে দেখা 'আল্পস্' এর মত নয়। যেন কৃষ্ণাভনীল অরন্যানীর কম্বল জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। মাথায় তার বরফের 'আইস ব্যাগ' যেন জ্বর জর্জ্জর দেহে অচেতন। আর ছিল কাল বামুনের গলায় শুভ্র উপবীতের মত কৃষ্ণনীল পর্ব্বত শ্রেণীর বুকে শুভ্রস্রোতস্বিনীর রজতধারা। কিন্তু দেখলাম কাকে! ইউরালের উপর দিয়ে উড়াল দিয়ে যাচ্ছি—না দেখছি আল্পসের অল্প-স্বল্প!

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নিম্নপ্রেক্ষণ চল্‌ল কিছুক্ষণ। আবার শুরু হয়ে গেল দৃষ্টি প্রতিহতকারী পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মেলা। অতুলপ্রসাদের গান শুনেছিলাম ছেলেবেলায় ৺সুরসাগর হিমাংশু দত্তের মুখে—
"মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোনখানে—
ও আকাশ বল আমারে।"

অভিসারিণী মেঘকন্যাদের দেখে সেই ছেলেবেলার গান মনে পড়ে গেল—যদিও কবি এদের দেখেছিলেন ভূপৃষ্ঠ থেকে, আর আমার এ দেখ মেঘলোকের উর্ধে বিহার করতে করতে।

মেঘেঢাকা ইউরোপের মুখের চকিত দর্শন মাঝে মাঝে যে হচ্ছিল না তা নয়। তবে তাতে কি আর সাধ মেটে! তবে এটাও ঠিক, তেত্রিশ হাজার ফিট উপর থেকে মেঘেগড়া মায়ারাজ্য অবলোকনও একটা ফেলনা অভিজ্ঞতা নয়। মেঘ দিয়ে গড়া আস্ত একটা রাজ্য যেন! তাতে বরফের পাহাড় ফাঁকে ফাঁকে বরপাবৃত প্রান্তর ভেদ করে নীল আকাশের নীল নদী। যেন সত্যই স্বপ্নে দেখ, এক নিঃসঙ্গ মেরুঅঞ্চল চাঁদের আলো গায়ে জড়িয়ে স্বপ্নমগ্ন!

আল্পস্ দর্শন হল কিনা হলফ্ করে বলতে পারব না না। তবে যা দেখা হল তাও নিশ্চয়ই নগণ্য নয়।

দুপুরের কাছাকাছি বিমান লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী হল। এবার মেঘ-রাশি ভেদ করে ধীরে ধীরে বিমান নামছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীচের জনপদ মাঠঘাট, পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সবুজ মাঠ, ক্ষেত, খামার, লাল লাল বাড়ীঘর, ঠিক যেন ছবি দেখছি। এ দৃশ্য ছবির মারফৎ ঢের দেখছি বলেই হয়ত এত পরিচিত মনে হচ্ছে।

বিমান অবতরণ করলে আমরাও অবতরণের জন্য তৈরী হলাম। বিলাত দেশটা সত্যি 'সোনার না মাটির' সেটাও ত পরম করে দেখা দরকার।

নামবার আগেই পাইলট ((Pilot) মাইক্রোফোনে জানিয়ে দিলেন—"একটু আগে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে, তাপাঙ্ক পঞ্চাশ ডিগ্রি

ফারেনহাইট" ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃষ্টির জন্য কোথাও বা সামান্য জল দাঁড়িয়েছে। ঘাস পাতা সব ভিজে ভিজে। একটা স্যাঁতস্যোঁতে ঠাণ্ডা ভাব,—অনেকটা শিলং এর মত। সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—ভারতীয়ই বেশী। আমাদের মত বৃদ্ধবৃদ্ধার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তাঁদের অনেকেই আমেরিকাবাসী পুত্র কন্যা সন্দর্শনে যাচ্ছেন, আমাদেরই মত। আলাপ জমাতে বিলম্ব হল না।

এই বিমান বন্দরেব বিশ্রামাগার (ট্রান্‌জিট্ লাউঞ্জ) যেন আমাদের দেশের এক মেলা বিশেষ। কত লোক জন, কত রকমারী দোকান পাট, পান ভোজনের আয়োজনই বা কত। কর্মরতদের মধ্যে ভারতীয়ও রয়েছেন,—তবে খুব একটা সম্মানের কাজে নিযুক্ত নয়। 'নিঙারি নিঙারি' না হলেও 'পরি নীল শাড়ী' এক পঞ্চনদ দুহিতাকে দেখলাম। নীল দস্তানা পরে রুজরক্তিম গণ্ডে এক বিদেশী সম্মার্জ্জনী হস্তে ভ্রাম্যমানা। একাধিক পানাগারে কর্মব্যস্ততা। তারই একটাতে দেখলাম—পাগড়ী মাথায় এক সর্দ্দারজী শূন্যপাত্র সংগ্রহে ব্যস্ত। অন্যত্র দেখলাম—একটি পণ্যবাহী চক্রযুক্ত ঠেলা ঠেলছেন দুই ব্যক্তি, তার একজন ভারতীয়,—বয়স চব্বিশ পঁচিশ অনভ্যস্ত হাতে ঠেলাটা সামনে থেকে টানছেন আর অপর ব্যক্তি পেছন থেকে ঠেলছেন। ঠিক মত হয় নি.—ঠেলাটা তার গোড়ালির উপর দিয়ে চলে গেল। ল্যাং চাতে ন্যাংচাতে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা—"ইয়ে ক্যা কিয়া ইয়ার!"

শুনেছিলাম বটে—অর্থাভাবে অনেক ভদ্রসন্তানকে বিদেশ বিভুঁইয়ে যেতে হয়। এবার প্রত্যক্ষ করা গেল।

বিরক্ত মন বলে উঠল—"ঢের হয়েছে, আর দেখে কাজ নেই।" অতএব বিমানে পুনঃ প্রবেশের প্রতীক্ষায় রইলাম।

— ঃ০ঃ —

[লণ্ডন-নিউইয়র্ক-মিনিয়াপোলিস্]

বিরস বদনে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কিছুক্ষণ পরেই ইলেকট্রনিক বোর্ড (Electronic board) এর গায়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে ফিরে যাবার সংকেত ফুটে উঠল। যাত্রীরা সবাই দুর্গা দুর্গা বলে উঠে পড়লাম। গোলকধাঁধাঁর মত নানা জায়গায় চক্কর কেটে কেটে নিরাপত্তার অনুরোধে কৃত নানাবিধ পরীক্ষায় (Security check) উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে এক সময় বিমান গর্ভে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করা গেল। নীচের মাঠ, ঘাট, ঘর বাড়ী, নদ নদী ক্রমে বড় থেকে ছোট হতে হতে জরিপ করা মানচিত্রে পরিণত হল। পাতলা মেঘের ফাঁক দিয়ে আবছা দেখা ইংলণ্ডের মাটি, পাহাড়, গাছপালা, ঘরদোর ক্রমেই বাস্তব থেকে ছবি, ছবি থেকে স্বপ্ন, এবং স্বপ্ন থেকে যেন সুসুপ্তির পূর্ণাবলুপ্তিতে পর্য্যবসিত হল।

আটলান্টিকের মেঘের ওড়না ঢাকা মুখ দেখতে পাচ্ছি না। যদিও নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে মেঘনাথ মেঘনাদ আমরা কেউ হইনি, তবুও অপরের অলক্ষ্য থেকে অবলীলাক্রমে মেঘলোকে বিহার করে চলেছি। এবার আমরা অ কূলান্ত আটলান্টিক পার হয়ে সোজা নিউইয়র্কে নামব! চক্ষু গবাক্ষনিবদ্ধ এই হীন আশায় যদি দৈবাৎ আটলান্টিকের ক্ষীণাভাস ক্ষণিকের জন্যও দেখতে পাই।

এতক্ষণে এয়ারইণ্ডিয়ার বিমান সেবিকারা যাত্রীদের রাজকীয় ভোজে আপ্যায়িত করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

একে পেটরোগা বাঙ্গালী—তায় বৃদ্ধবৃদ্ধা। সুতরাং 'কিঞ্চিৎ না হই বঞ্চিৎ'—এর উপর দিয়েই এপবর্ব সমাধান করা হল।

এবার খাওয়ার পাঠ চুকলে বিমান কর্ম্মীরা বাতি নিবিয়ে জানালা বন্ধ করে যাত্রীদের সুখনিদ্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করা

গেল। কি একটা ব্যাপার নিয়ে পার্শ্ববর্তিনী এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ হল। জানালেন—তিনি দর্শনের অধ্যাপিকা। তাঁর গুরু একজন ভারতীয়। বিশেষ করে তাঁর আশ্রমেই তিনি এসেছিলেন শুনে ভাল লাগল। কথায় কথায় পণ্ডিচেরী ও শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ এসে গেল। তিনি বল্লেন—তিনি নাম শুনেছেন মাত্র—এখনো তাঁর বই পড়ার সুযোগ হয়নি। আমার কাছ থেকে কয়েকটা বইএর নাম টুকে নিলেন। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না ; এটা তার ক্ষেত্রে "থ্যাঙ্কইউ" পর্য্যায়ের মৌখিক ভদ্রতা কিনা। তবে এ ক্ষেত্রে হয়ত তা নাও হতে পারে; কারণ তিনি যে দর্শনের অধ্যাপিকা। কেন জানিনা—সাধারণ লোক ত বটেই—যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে দাবী করেন, তাঁরাও শ্রীঅরবিন্দের বই হাতে নিতে ভরসা পান না। কে জানে কেন এই অনীহা!

ঘুমের বিফল সাধনার ফাঁকে ফাঁকে জানালা খুলে উঁকিঝুঁকি মারছিলাম, কিন্তু বৃথা। মেঘাবরণাবৃতা আটলান্টিকের ওড়না ঢাকা মুখ শুধু মনকে উন্মুখ করেছিল, নয়ন থেকে যাচ্ছিল তেমনি বুভুক্ষু।

নিউইয়র্ক চারটা নাগাদ পৌঁছাবার কথা। ভাবছি সারাটা পথই কি এমনি যাবে। কা সৌভাগ্য আমার। তা হল না। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই মেঘাবরণ পাতলা হয়ে ফাঁকে ফাকে নীলাকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম যেন। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীলাকাশ না অন্য কিছু? ভাল করে দেখে সন্দেহ ঘনাল। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে গরমের দিনেও উত্তর মহাসাগর থেকে ভেসে আসা দক্ষিণগামী বরফের চাঁই হামেসাই নয়নগোচর হয়ে থাকে। উত্তর মেরু থেকে আগত বরফের চাঁইবাহী এই শীতল জলস্রোতই উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে এত শীতল করে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে ভাসমান বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে টাইটানিকএর ডুবে যাওয়ার কথাও মনে পড়ল।

এটা সাদা মেঘ আর নীল আকাশ—না সত্যি সত্যি নীল সমুদ্রে ভাসমান সাদা বরফের চাঁই? অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর স্থির বিশ্বাস

হল—বইএ পড়া ভূগোলের বিবরণ আজ চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। আমাকে ওরকমভাবে দেখতে দেখে আরও অনেক যাত্রী গবাক্ষবর্ত্তী হয়ে নিম্ন-প্রেক্ষণ করতে লাগলেন। বিমান কি একটু নীচু দিয়ে যাচ্ছিল! তা না হলে কী করে এত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম কুঞ্চিত চামড়ার মত জলের ঢেউ, অসংখ্য কালচে বাদামী দ্বীপপুঞ্জ—চার পাশে বরফ জমে আছে, যেন চোখের নীচে অঞ্জন লেখা। আর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম নীল আকাশে ভাসমান শুভ্র মেঘপুঞ্জের মত নীল সমুদ্রে ভাসমান শুভ্র বরফমেখলা, পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণাভবাদামী দ্বীপ পুঞ্জ আর নানা আকারের ভেসে বেড়ানো নিরুদ্দেশযাত্রী বিবাগী বরফের চাঁই। ডাঙ্গা বা সমুদ্রবক্ষ থেকে ভাসমান বরফের চাঁই দেখা আর পাতলা মেঘের অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে বহুনিম্নের এই নীলাঞ্জন স্নিগ্ধ স্বপ্নময় দৃশ্যাবলোকন—সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ আমার চোখের ভুল বা স্বকপোলকল্পিত দৃশ্য ছিল না; আমারই মত বহু যাত্রী সেদিন এই বিরল দৃশ্য উপভোগ করে ধন্য হয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে আটলান্টিক মিলিয়ে গেল। আমরা এখন ডাঙ্গার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। কিন্তু মেঘাবরণ যেন ছিন্ন না হয়ে আরও ঘনীভূত হল। নিউইয়র্কের কাছে এসে ত ধারাবর্ষণই শুরু হল। তবে এ ধারাপাত বালনিদ্রাহরণ সে 'ধারাপাত' নয়; নয় সে আসাম বা পূর্ববঙ্গের অষ্টপ্রহরব্যাপী ঘনবর্ষণ। সাধুর ক্রোধের মতই এ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। অচিরে মেঘের প্রাচীরে ফাটল ধরল,—তার ফাঁক দিয়ে কেনেডি বিমান বন্দর দেখা যাচ্ছে। তার এক পাশে সমুদ্রের একটা ফাঁড়ি হাত বাড়িয়ে —যেন সিন্ধুজননী সুপ্ত অপত্যের গায়ে হাত রেখে শুয়ে রয়েছেন'— সমুদ্রের ঢেউ যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস জনিত বুকের উঠা নামা।

এক সময় বিমান ধীরে ধীরে ভূমিস্পর্শ করল।

—"ওঠ মুসাফির খতম তেরি
আব দানা হো গয়া"।

এতক্ষণে যাত্রা শেষ। যাত্রীরা এবার নেমে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। আমরাও একসময় ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নেমে এলাম এবং ধীরে ধীরে বহিরাগতদের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্থান—'ইমিগ্রেশান কাউন্টার'এ লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। নামবার আগেই কাস্টমস্ সংক্রান্ত কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম। কত মূল্যের জিনিষপত্র সঙ্গে রয়েছে সেই অনুসারে লাল, সবুজ নানা রং এর লাইনএ দাঁড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে। বয়সে 'সবুজ' কিনা—তাই আমরা সবুজ লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্রীমার কৃপায় ইমিগ্রেশান অফিসার খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছুটি দিয়ে দিলেন। বাকী রইল 'কাষ্টমস্' এর শক্ত পাল্লা। ঝামেলা ত হলই না; বরং ভদ্রলোক নিজে থেকেই সব ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে এখানে মালপত্র আমাদের বইতে না হয়;—সোজা মিনিয়াপোলিসে নেমে মাল খালাস করলেই চলে।

অতঃপর চিন্তাবিযুক্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা ব্যাগ কাঁধে গেটের বাইরে এসেই দেখি অদূরে কন্যা মিতার ভাসুর মিন্টু ও শ্যালিকা মঞ্জু তার স্বামী পার্ব্বতীকুমার সহ সহাস্য বদনে দণ্ডায়মান। এবার সত্যি সত্যি সর্ব্বশঙ্কাবিমুক্ত গৃহিনীর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে স্বজন দর্শনে অনাবিল আনন্দ হবারই কথা,—হাসি ঠাট্টা প্রভৃতির মধ্যেমে তার বহিঃপ্রকাশ কিঞ্চিৎ হল। এক ফাঁকে কন্যাকে ফোন করে আমাদের আগমন বার্তাও জানান হল। অতঃপর কি করা যায়। হাতে প্রচুর সময়। কেননা মিনিয়াপোলিসের বিমান ছাড়ার এখনো ঢের দেরী।

পার্ব্বতী প্রস্তাব করল—"চলুন দাদা! চা কফি কিছু পান করা যাক। অতি উত্তম প্রস্তাব। কনিষ্ঠা শ্যালিকা মঞ্জুকে বল্লাম—"হে সুভগে! প্রাচীন কালের মাধ্বীর জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে ঠিক করেছি তোমার সঙ্গে এক পাত্র চা'ই পান করব।" সে বলে উঠল—"না দাদা! আর চা চাপাবেন না; দিদি আর আমি এই বেলা একটু ঠাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হই।"

কনিষ্ঠা শ্যালিকা আবার যেমন বিদুষী তেমনি নৃত্য পটিয়সী। বল্লাম —"ঠিকই বলেছ। চা চাই না, না চা'ই চাই। তা হলে শোন এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিবাবুর এক বিখ্যাত রসিকতা। একদা তিনি তাঁর এক নাতনীকে চা খেতে আহ্বান করাতে সে বলেছিল—"না না, চা চাই না।" শুনে ক্ষিতিবাবু বলে উঠলেন—"তা ত ঠিকই; আমি চা'র দলে আর তুমি না-চার দলে।" অপ্রতিভ নাতনী শুধরে নিয়ে বল্ল—"না না—না চা'র নয়; আমি No tea-র দলে।" ক্ষিতিবাবু অমনি বলে উঠলেন—"তাই বুঝি? আমি Tea-র দলে আর তুমি ন'টীর দলে।" হাসতে হাসতে শ্যালিকা তার দিদিকে সঙ্গে নিয়ে আইসক্রিম ও ইয়োগার্ট অর্থাৎ দধির আমেরিকান সংস্করণ আস্বাদন করতে চলে গেল। পেছনে পড়ে রইলাম প্রেষিতার্দ্ধাঙ্গিণী আমরা দুজন। পার্ব্বতীকে বল্লাম—"না চা'র দলের ওঁরা যখন আমাদের নাচার করে চলেই গেলেন—তখন অপয়া চা তে আর কাজ নেই। চল এক এক পাত্র কফিই পান করা যাক্—কাফই 'কাফি'।"

অতঃপর রেস্তোরাঁতে পার্ব্বতীর কিছু রেস্ত খসিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। এবার আমাদের কেনেডি বিমান বন্দরের অন্তর্দেশীয় অঞ্চলে (Domestic Wing) যেতে হবে। 'অচল মাল' এর ব্যবস্থা কাস্টমস্ অফিসারই করে দিয়েছেন। বাকী ছিল সচল মাল—আমরা দু'জন। সে ভার নিয়েছে মিণ্টু ও মঞ্জু পার্ব্বতী। পায়ে হেঁটে অনায়াসেই যাওয়া যেত। কিন্তু সবাই মিলে এয়ারওয়েজের মুফতের বাসেই যাওয়া ঠিক হল। অচিরেই অন্তর্দেশীয় বিভাগে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের মেয়েরা যেমন বাইরে গেলে প্রসাধিতা, ঘরের বেলায় সাদাসিধা—কেনেডি এয়ারপোর্টও দেখছি ঠিক তাই। আন্তর্জাতিক অঞ্চলের জাঁকজমক এখানে অনুপস্থিত। যদিও প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে বিদ্যমান। আড়চোখে এসব নিরীক্ষণ করছি আর উপভোগ করছি। সবাই মিলে নিউ নিউ ইয়াৰ্কি উদ্ভাবন করে কি করে নিউইয়র্ককে নিউ ক্যালকাটা বানিয়ে ছাড়ছেন। সময় যেন পাখা মেলে উড়ে গেল!

মিণ্টু আবার নিউজার্সি যাবে,—অনেকটা পথ। তাই তাকে আটকে না রেখে মিনিয়াপোলিসের বিমানে উঠিয়ে দেবার ভার মঞ্জুরা

নিজেরা নিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। ঠিক হল আমাদের বিমানে উঠিয়ে ওরা নিউপলজ্ ফিরে যাবে।

যথাসময়ে 'নর্থ ওয়েস্ট ওরিয়েন্ট' এর বিমানে আমাদের উঠিয়ে দিয়ে ওরা বিদায় নিল। বল্লাম—"পুনর্মিলনায় চ; কিছুদিনের মধ্যেই ত আবার ক্যানেডাতে দেখা হবে।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এবার। বিমান মাটি ছেড়ে গগণ বিহার শুরু করল। বিরাট বিমান—কিন্তু প্রায় শূণ্যগর্ভ;—অনেকটা আমার ঘটে বুদ্ধির মত। কী-ব্যাপার! পরে শুনেছিলাম—বিশেষ বিশেষ দিনে এই বিমানে যাত্রী কমই হয়। আঁধারে অবলুপ্ত মাঠ ঘাট ও বহু নিম্নের দ্বীপান্বিতা শহর দেখতে দেখতে ডেট্রোয়েট স্পর্শ করে মিনিয়া পোলিসে যখন শেষ পর্য্যন্ত পৌছালাম—তখন রাত বারটা। তা আমাদেরও প্রায় বারটা বেজে যাওয়ার অবস্থা। পথশ্রমক্লান্ত দেহে বিমান থেকে নেমে দেখলাম কন্যা জামাতা ও দৌহিত্রটি দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে গৃহিণী এবং আমি সর্ব্বশঙ্কার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বিমলানন্দে পথশ্রমের সব ক্লেশ যেন ভুলেই গেলাম। জামাতা পিন্টু ক্ষিপ্রহস্তে মাল টাল খালাস করে নিল। এদেশে মুটে মোটেই সুলভ নয়। শ্বশুর জামাতা মিলে ঠেলা গাড়াতে মাল চাপিয়ে গাড়ীতে মাল উঠান হল। মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধ মিনিয়াপোলিসের শহরতলির মাইল বিশেক চক্কর কেটে যখন মিতাদের বাড়ী পৌছান গেল—তখন রাত প্রায় একটা। এতরাত্রে খাবার হাঙ্গামায় কে যায়! প্রায় দু দিন দু রাত্রি অনিদ্রার পর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়া ঢের বেশী কাম্য। অতএব তাই করা হল।

দীর্ঘভ্রমণের ধকল কাটাতে কয়েকদিন অতিবাহিত হল। আমরা একটু ধাতস্থ হয়েছি দেখে পিন্টু জানাল, উত্তর আমেরিকা ও ক্যানেডা দর্শনের জন্য দীর্ঘ ভ্রমণসূচী প্রস্তুত এবং অচিরেই যাত্রা শুরু হবে।

অতঃপর সেই কাহিনীতেই আসছি। ভ্রমণ দীর্ঘ—বিবরণও দীর্ঘ হতে বাধ্য। অতএব তোমার ধৈর্যের প্রকৃষ্ট বৃদ্ধির জন্য শ্রীমার কাছে প্রার্থনা করছি।

[যমজনগরী (Twin cities) মিনিয়াপোলিস ও সেন্টপল্ভর্ন মিসিসিপি নদী উইস্কন্সিনডেল্ (Wisconsin Dell)]

লেক ডেল্টন মোটেল,

উইসকনসিনডেল,

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিচিত্র ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া সম্পন্ন বহু রাজ্য রয়েছে। তাদের কোনটা বা শীতপ্রধান,—শীতে তুষার সমাহিত, কোনটা বা মরু অঞ্চল,—কোনটা বা প্রায় মেরু অঞ্চল; —কোথাও গ্রীষ্মের আধিক্য—কোথাও শস্যশ্যামল সমতল প্রান্তর, কোথাও দিগন্তপ্রসারী পুষ্পাকীর্ণ তৃণভূমি, আবার কোথাও বা তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ আবার কোথাও অপূর্ব্ব নগনদ অরণ্যানী ও হ্রদ সমৃদ্ধ স্বপ্নের দেশ।

কন্যা ও জামাতা প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে আমার দুর্ব্বলতার বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিল। তাই তারা ঠিক করেছে আমাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য-সমৃদ্ধ পঞ্চহ্রদ পরিক্রমা করাবে। উত্তর আমেরিকার মিনেসোটা, উইস্কন্সিন্, ইলিনয়েস্, ইণ্ডিয়ানা, ওহাইও, পেনসিল্ভেনিয়া, নিউজার্সি, ওয়াসিংটন, নিউইয়র্ক, মেছাচুসেটস্, নিউহেম্পসায়ার এবং মেইন হয়ে ক্যানেডার ক্যাবেক (Quebec) ও অণ্টারিওতে গিয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা হবে। টরেন্টোতে আমার কনিষ্ঠ শ্যালক নীলাদ্রি ওরফে চাঁদুর বাড়ীতে কিছু দিন থেকে নায়েগ্রা প্রপাত এবং টরেন্টোর আশেপাশের দর্শনীয় স্থান দেখে পঞ্চহ্রদের ক্যানেডার তীরবর্ত্তী উপকূল ধরে ধরে স্যাস্যুমেরী (sault ste Marie) হয়ে আবার আমেরিকার মিশিগান হয়ে উইস্কন্সিনে ঢুকব এবং উইস্কন্সিন্ পার হয়ে মিনেসোটাতে এবং সেখান থেকে মিনিয়াপোলিসে মেয়ের বাড়ীতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করা হবে।

অতিদীর্ঘ এই মোটর ভ্রমণের পরিকল্পক, পরিচালক এবং চালক জামাতা অরিজিৎ ওরফে-পিণ্টু। বালবৃদ্ধবণিতা সমন্বিত যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে কলত্র কন্যা ও দৌহিত্রসহ এই বৃদ্ধ। দৌহিত্রটি আবার নিতান্তই শিশু; দু'বছর পোরেনি এখনও।

পিণ্টুর ইচ্ছা পথে সেন্‌ডাস্কিতে তার বহুদিনের বন্ধু ও সহপাঠী মধু চাটার্জ্জির বাড়ীতে দু'রাত কাটিয়ে যাওয়া;—খড়্গপুর আই, আই, টি তে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর এক সঙ্গে পড়েছে এবং ভাগ্যানুসন্ধানে একই সঙ্গে আটলান্টিক পেরিয়ে এ দেশে এসেছে। শুনে সবাই এক বাক্যে রাজী হয়ে গেলাম। মধুময় এমন্ প্রস্তাব না-মঞ্জুর করার মত হৃদয়হীন কেই বা আছে। সবাই চায় তার মধুমিলন যথার্থ মধুময় হোক।

মধু থাকে ইরিহ্রদের (Lake Erie) তীরবর্ত্তী সেনডাস্কিতে, এখান থেকে প্রায় ছ'শ মাইল দূরে। এক দিনে ছ'শ মাইল গাড়ী চালান কষ্টসাধ্য; বিশেষতঃ দু'বছরের কচি বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে। তাই ঠিক হল আটই মের পরিবর্তে সাতই মে বিকেলে বেরিয়ে দু তিনশ মাইল দূরের উইস্‌কন্‌সিন্‌ডেলের একটা মোটেলে অর্থাৎ গ্যারেজ সম্বলিত একটা হোটেলে রাত্রিবাস করে পরের দিন চাঙ্গা হয়ে নিয়ে সেনডাস্কি যাত্রা করা হবে।

কচি বাচ্চা নিয়ে সতের আঠার দিনের সফর,—তার জন্য অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। কন্যা মিতার ইচ্ছা—পারলে গোটা সংসারই সঙ্গে নিয়ে যায়। মনে পড়ছে—দিল্লীতে একদা অনুরূপ এক দৃশ্য দেখেছিলাম বটে,—এক সর্দ্দারজীর বাড়ী বদল করার দৃশ্য। তিনি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন, মাথায় খাটিয়া, সামনের হ্যাণ্ডেলে একটি বাচ্চা বসে, আর পেছনের কেরিয়ারে তার গৃহিণী বসে আছেন। তার মাথায় একটি বড়সড় পুঁটুলি আর কোলের কচি বাচ্চাটি পরমানন্দে মায়ের দুধ খাচ্ছে। আমাদের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। দু'দিন আগে পিণ্টু গাড়ীর মাথায় রাখার জন্য একটি প্ল্যাষ্টিকের সিন্দুক জাতীয় দ্রব্য কিনে আন্‌ল। তার গর্ভে বহু বাক্স পেটরা অবলীলাক্রমে ঢুকে

যাবে। স্খলিতকচ্ছ গলিতঘর্ম শ্বশুর জামাতার যুগ্মপ্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সে বস্তুটিকে পূর্ববর্ণিত সর্দ্দারজীর পাগড়ির মতই গাড়ীর মাথায় জমিয়ে বসান হল। তাতেই সর্ব সমস্যার সুসমাধান হয়ে গেল, মিতাও নিশ্চিন্ত।

যাত্রার দিন এসে গেল,—মাতা ও কন্যার গোছগাছ করা নিয়ে কর্ম্মব্যস্ততার শেষ নেই। পিন্টু একটু সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে এলেই মালপত্র গাড়ীস্থ করার কাজটা সবাই মিলে সুসম্পন্ন করা হল। শ্রীমার নাম নিয়ে বিকেল ঠিক চারটা পনের মিনিটে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

এদিকে মিনিয়াপোলিসের আকাশের মুখভার,—তা আমাদের মত সদ্য পরিচিত নবাগতদের আসন্ন বিরহে নিশ্চয়ই নয়। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল—"রিম ঝিম বাদরোয়া বরষে"।

তবে ঘনবর্ষণ মোটেই নয়। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে মিনিয়া পোলিসের রাস্তাঘাট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তার দু'ধারে সযত্নে লাগান নানা জাতীয় পাইন, সিডার, ওক, কটনউডের গাছ। উঁচু নীচু ঢেউ খেলান মাঠ বাট, মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী,—ছবির মত সুন্দর। নানা আয়তনের হ্রদ রাস্তার দু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দু'পাশে বন্য ঘাসের ফুল—সাদা, হলদে, লাল, বেগুনী—অজস্র অগণ্য। কী পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে রাস্তা ঘাট। উজান ভাটি দু'দিকে যাবার জন্য আলাদা আলাদা রাস্তা। তাতে একাধিক লেন (lane)। মাঝখানে একফালি সবুজ জমি। এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় যাবার জন্য বর্হিগমনের নানা গলি (Exit)। অসংখ্য উড়াল পুল (Flyover) আর রাস্তার এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত পথনিয়ন্ত্রণের নানা লিখিত ও আলোকিত নির্দেশ।

রাস্তা ঘাট ঝকঝকে তকতকে। কেন জান? "ঠেলার নাম বাবাজী"।—যেখানে সেখানে নোংরা ফেললে কড়কড়ে দু'শ ডলার জরিমানা। তার জন্য একটু দূরে দূরে রাস্তার ধারে ধারে ঢাকনা দেওয়া পিপে

(Drum) নোংরা ফেলার জন্য রাখা আছে। বেশ ভাল লাগছিল ছিমছাম সদাপ্রসাধিতা এই নগরীকে দেখে।

মিসিসিপির দুই তীরে দুই শহর,—মিনিয়াপোনিস আর সেণ্টপল।

আদরের নাম—জমজনগরী (TwinCities)। পিণ্টু জানিয়ে দিল সামনেই মিসিসিপি নদী। মনের মধ্যে উত্তেজনা। ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি মিসিসিপি, মিসৌরী, আমাজান, নীল, ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াংহো। নামগুলো উচ্চারণ করলেই মনে জাগত শিহরণ। কল্পনায় যেন পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীদের দেখতে পেতাম।

কিন্তু একি সেই মিসিসিপি! এ যে কোলকাতার গঙ্গার আধখানাও নয়। একটু আশাহত হলাম বৈ কি। কিন্তু মিসিসিপির কোন দোষ নেই,—এ তার নিতান্তই শৈশবাবস্থা। তার উৎপত্তিস্থল ত এখান থেকে বেশী দূরে নয়। গোমুখীতে ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গা দেখবার প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আদুরে আব্দার—আদিখ্যেতা।

একটু পরেই মিসিসিপির পুল পেরিয়ে সেণ্টপল শহরে ঢোকা গেল। বড় বড় দোকানপাট, রাস্তা ঘাট, অট্টালিকা, প্রাসাদ, পার হয়ে এক সময় শহরতলিতে ঢুকলাম। 'দশ হাজার হ্রদের রাজ্য' মিনেসোটাকে নিয়ে এরাজ্যের লোকদের গর্বের অন্ত নেই। তার পাশের রাজ্য উইস্কনসিনেও কিন্তু ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় সম সংখ্যক হ্রদ রয়েছে। কিংবদন্তী এক 'পল বুনিয়ান' এর নীল ষাঁড়ের পায়ের ক্ষুরের চিহ্নই নাকি এই সব হ্রদ। যদি তুষার যুগের হিমবাহকে নীল ষাঁড় বল—তবে এ গল্প মেনে নিতে আপত্তি নেই। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকরা ত তাই বলে থাকেন। যত দক্ষিণে যাবে এই হ্রদগুলি ততই অগভীর, আর যত উত্তরে যাবে ততই গভীর আর প্রস্তর সঙ্কুল। ভূমি এখানে নাতি-সমতল; ঢেউ খেলান, তাতে পাইন সিডার ও অন্যান্য এতদ্দেশীয় বন-বৃক্ষের ভিড়। এই উর্বর রাজ্য একদা ছিল মিনোমিনী ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল।

দশ মাইল যেতে না যেতেই এসে গেল ক্রয় নদী (Croix)। এটা মিসিসিপির একটা উপনদী। দু'ধারে পাইন, এ্যাস্, সিডারের ঠাস বুননি, ফাঁকে ফাঁকে ঢেউ খেলান দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, কদাচকর্ষিত, বেশীর ভাগই অযত্ন বর্দ্ধিত বন্য কুসুমাস্তীর্ণ তৃণভূমি। মাঝে মাঝে দু'একটা নিঃসঙ্গ কাঠের বাড়ী যেন চিত্রার্পিত।

আমরা এবার এগিয়ে চললাম ৯৪ নম্বরের রাজপথ (Highway 94) ধরে। আকাশ মেঘমেদুর—চারিদিকে নরম মৃদু আলো। সূর্য্যাস্ত এখানে হবে রাত ১০ টায়। যে দেশ বিষুব রেখার যত বেশী উত্তরে বা দক্ষিণে সেখানে প্রদোষ ততই প্রলম্বিত। সূর্য্য ডুবতে ডুবতেও ডুবতে চাননা যেন।

"যস্মিন দেশে যদাচার।" —আমাদের দেশে অবসর গ্রহণ করে থাকি আটান্নতে। আর এখানে পঁয়ষটিতে। এদেশে সূর্য্যদেবও তেমনি দেশাচার মেনে একটু গদ্দাং গচ্ছ ভাবেই অবসর গ্রহণ করে থাকেন।

যাক্গে,—নরম আলোয় চোখ মেলে বসে আছি। গাড়ী দ্রুত ধাবমান। হাড্সন, বল্ডউইন, উডভিলে—একের পর এক জনপদ পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি। একটু পর আমরা মিনোমোনি পার হয়ে চললাম। এক একটা ছোট শহর বা গ্রাম গঞ্জ আসছে আর রাস্তার পাশে সাইন বোর্ডে সগর্বে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে—তার জন সংখ্যা কত। লোক বসতি এখানে যেমন কম তেমনি অঢেল রয়েছে জমি,—আমাদের দেশের ঠিক বিপরীত। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই মোটর গাড়ী আছে। মোটরে ভ্রমণের রেয়াজ এত বেশী যে আমেরিকা ও ক্যানেডাতে রেলগাড়ী কার্য্যতঃ মালগাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা ঘাটের সুরক্ষণাবেক্ষণ, প্রতি দশ পনের মাইল অন্তর পেট্রোলপাম্প, রেস্তোরা, বিশ্রমাগার (RestRoom) জায়গায় জায়গায় রাস্তার পাশে টেলিফোন। গাড়ীতে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ হলে টেলিফোন করে সহজেই মিস্ত্রীকে খবর দেওয়া যেতে পারে।—সবরকম সুব্যবস্থা এখানে

রাস্তার পাশে পাশে সর্বত্র। রসদ সঙ্গেই ছিল বলে যাত্রা অব্যাহত রেখেই গাড়ীতে বসে বসে মাঝে মাঝে চা কফি ইত্যাদি পান করা চলছিল। বাইরে মৃদু আলো,—মাঝে মাঝে মৃদু বর্ষণ চলছে।

প্রায় ৭৫ মাইল গাড়ী চালিয়ে আমরা চিপ্পেওয়া নদী পার হলাম। দুই তীরের বৃক্ষরাজি যেন জল ছুঁয়ে আছে। ক্ষীণাঙ্গী এই প্রবাহমানা কলস্বিনীর শান্ত ঘরোয়া রূপটি বড় ভাল লাগল। এ যেন 'রাজর্ষি' খ্যাত আমার কৈশোরের সাথী বর্ষার গোমতী নদী। ক্রমে ক্রমে ব্র্যাকেট', 'নর্থফিল্ড', 'হিক্সটন', 'ব্লেকরিভার ফলস্', 'টমা', 'নিউ লিবসন,' প্রভৃতি জনপদ পেছনে ফেলে গাড়ী অগ্রসর হতে থাকল।

সামনে উইস্‌কন্‌সিন্ নদী;—এ রাজ্যের নামও তাই। নাতিবৃহৎ এই স্রোতস্বিনী পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই উইস্‌কন্‌সিন্ রাজ্যকে এখানকার লোকেরা বলে "আমেরিকার কুটীর ভাণ্ডার"। বৃক্ষলতাদিপূর্ণ এ রাজ্য ক্ষেতখামারের প্রাচুর্য্য রয়েছে। লোকবসতি বেশী নয়,—যদিও পাশের রাজ্য মিনেসোটার তুলনায় অনেক বেশী। তৃণপুষ্পসমন্বিত 'প্রেইরি' (Praire) অর্থাৎ দীর্ঘ তৃণাকীর্ণ ঢেউ খেলান দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর :—কোথাও চষামাঠ, কোথাও বা মাঠের মাঝখানে উঁচু উঁচু দু'একটা কাঠের বাড়ী। চারপাশে গাছপালা,—মাঠে গরু চরছে ; আর থেকে থেকে আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট সাইলো (silo) অর্থাৎ এখানকার এক বিশেষ ধরণের শস্যভাণ্ডার। একটা খুব উঁচুমিনারের মাথাটা কেটে তারপর একটা বাটি উল্টে রেখে দিলেই হয়ে গেল 'সাইলো',। চাষার তুলনায় জমি এত বেশী যে যন্ত্র ছাড়া চাষ করা এক মহাযন্ত্রণা এবং তা কেউ করেও না। প্রত্যেক চাষীর বাড়ীতেই একাধিক গাড়ী রয়েছে।

আজ আমাদের রাত্রি যাপন করতে হবে একটা মোটেলে (Motel)। মোটেল ঠিক হোটেল নয়—তার বিশেষত্ব রয়েছে। হোটেলে যেখানে মানুষের সাদর নিমন্ত্রণ, মোটেলে সেখানে নিমন্ত্রণ রয়েছে মানুষ ও তার যানবাহন—উভয়ের জন্য। কী নেই এই মোটেল গুলিতে ?—তাপ

নিয়ন্ত্রিত শোবার ঘর, সাজানগোছান টেবিল, চেয়ার, সোফা, টেলিভিশন সেট, ফ্রিজ, ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা সম্বলিত স্নানাগার, শৌচাগার ইত্যাদি সবই রয়েছে। কোনো কোনো মোটেলে রান্নার জন্য আলাদা ব্যবস্থা, বিদ্যুত চালিত উনুন, রান্নার ও খাবার বাসন পত্রাদিও আছে। তবে রান্নাকরা খাবারের ব্যবস্থা কোনো মোটেলেই থাকে না। তাই বলে চিন্তারও কিছু নেই; নিকটেই রেস্তোরাঁ, পেট্রোলপাম্প, দোকানপাট সবই থাকে।

আগে থেকেই পিন্টু উইসকন্‌সিনডেলের পাশে লেক ডেলটন মোটেলের একটি কামরা অগ্রিম ভাড়া করে রেখেছিল। আমরা যখন লেক ডেলটন মোটেলে পৌঁছালাম—তখনো সূর্য অস্ত যায়নি, পশ্চিম দিগন্তে তখনো রঙবাহার।

আজ প্রায় ২৫০ মাইল মোটর ভ্রমণ করা হল। মোটেলে পৌঁছে সবাই মিলে গাড়ী থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নামিয়ে নিলাম। তারপর একে একে গরম জলে স্নান সেরে চটপট হিটারে চা তৈরী করে খেয়ে নিলাম সবাই।

রাত্রের খাবার মিতা সঙ্গেই এনেছে। হিটারে গরম করে কাগজের প্লেটে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৈশভোজন শেষ করা হল। দৌহিত্রটিকেও অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছুটা খাওয়ান হল। এবার বাকী কম্বলের তলায় সুখনিদ্রা। সদ্যবর্ষণসিক্ত বাতাসে কিঞ্চিৎ শৈত্য থাকাতে ঘুমের আবেশ আসার সুবিধাই হল। আজ ত কিছুটা ঘুমিয়ে নেই; কালের কথা কাল সকালের জন্য তোলা থাক।

[লেক ডেলটন-শিকাগো-সেনডাক্সি-ইরিহ্রদের তীরে তীরে]

সেনডাস্কি

৯ই মে, ১৯৮৪ ইং

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে স্নানাদি সেরে প্রাতরাশ পর্ব চটপট চুকিয়ে যাত্রার জন্য সবাই প্রস্তুত হলাম। কিন্তু তাড়া দিলেই ত আর ত্বরা হয় না, গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে সেই ন'টা। মেঘ কেটে রৌদ্র তখন ভিজে পাতায় ঝলমল করছে আর ঘাসের ডগায় মুক্তার মত ঝলমলে শিশিরকণা।

আমরা এখন ৯৪ নম্বরের রাজপথ ধরে যাচ্ছি। মাঝে মাঝেই দেখছি উইস্‌কন্‌সিন্ নদীটি ছোট্ট মেয়ের মত আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে চলেছে,—চট করে উঁকি মেরে এক ঝলক মুক্তা ছড়িয়ে অমনি দ্রুত পলায়ন। 'পোরটেজ' পার হয়ে শেষবারের মত পার হলাম উইস্‌কন্‌সিন্ নদী। ২০/২৫ মাইল যেতে না যেতেই পার হতে হল আর একটি ছোট নদী। কিছুদূর গিয়ে এটি পড়বে লেক-মেনডোটাতে।

আমাদের গাড়ী 'মেডিসন,' নামক জনপদ পেছনে ফেলে 'বেলওয়েল' হয়ে এবার ঢুকল 'ইলিনয়িস্' রাজ্যে। যাবার পথে পড়ল 'বেলভিডিয়ার' 'ডাণ্ডি' প্রভৃতি জনপদ। এবার আমরা চলেছি 'শিকাগো' শহরের দিকে। 'শিকাগো' নাম শুনেই শিহরিত না হয়ে পারি! —এ যে বিবেকনন্দের পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত সেই শিকাগো।

এখানেই বাংলার এক অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণ সন্ন্যাসী একদিনেই বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন। এই আকস্মিক আবির্ভাবের যোগ্য বিবরণ মেলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতায় ঃ—

"অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজ বৈরাগী
গিরিদরী তলে,
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে,
সেই মত বাহিরিলে—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে—
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা!"

আমার ত মনে হয় বিবেকানন্দের এই আবির্ভাব আরও বেশী আকস্মিক ও চমকপ্রদ। শিবাজীর বিজয়পতাকা শুধু ভারতের এক প্রান্তের গগনকে আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু বিবেকানন্দের বিজয়পতাকা সমগ্র উত্তর আমেরিকা, ইয়োরোপের কিয়দংশ এবং সমগ্র ভারতে উড্ডীয়মান হয়েছিল।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে এই-খানে পরাধীন ভারতের এক অখ্যাত অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল ভারতের সনাতনধর্মের এক সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক উদারবাণী —যা আমেরিকার তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের হৃদয় পলকে জয় করে নিয়েছিল। লুপ্ত গৌরব পরাধীন ভারতের পক্ষে সে এক অবিশ্বাস্য আত্মিক দিগ্বিজয়।

সত্য বটে দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মও জগতে অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তবে তার পশ্চাতে ছিল সম্রাট অশোকের রাজশক্তি। এই কপর্দ্দকহীন অজ্ঞাত পরিচয় তরুণ সন্ন্যাসীর একমাত্র সম্বল ছিল—তাঁর গুরুর কৃপা এবং নিজের আত্মবিশ্বাস ও অদম্য সাহস। শিকাগোর দুর্দ্দান্ত শীতে অভুক্ত গেরুয়াসম্বল সেই সন্ন্যাসী রাত্রি যাপনের স্থান কোথাও না পেয়ে অবশেষে স্টেশানের একটা খালি প্যাকিংবাক্সের মধ্যে শুয়ে রাত কাটালেন। সম্মুখে অলঙ্ঘ্য বাধা, কিন্তু বুকে জ্বলন্ত ভগবৎ বিশ্বাস নিয়ে তিনি অসম্ভবের সঙ্গে

যুদ্ধ করে চল্লেন। কখনো বোস্টন কখনো শিকাগো ঘুরতে ঘুরতে যখন নৈরাশ্যের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছেছেন, তখনই নিদাঘের খরতাপের পর প্রবল বর্ষণের মত নেমে এলো ভগবানের অসীম কৃপার স্বর্গীয় ধারা—মিস্টার এবং মিসেস্ হেল (Mr and Mrs Hell) এর মাধ্যমে।

সে দিন সোমবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। বেলা ১০টায় শুরু হল বিখ্যাত শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেখানে সমবেত। বহু যত্নে বহু পরিশ্রম করে তাঁরা তাঁদের বক্তৃতাবলী পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে এনেছেন। বিবেকানন্দই এঁদের মধ্যে তরুণতম-বয়স ত্রিশের কোঠায়। বক্তৃতা যে পূর্ব থেকে তৈরী করে আনতে হয় এটা তাঁর জানাই ছিল না। বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত বক্তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতবিহীন। পূর্ববর্ত্তী বক্তারা সদম্ভে যে যাঁর ধর্মের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করে গেলেন। এবার বিবেকানন্দের ডাক পড়ল। তিনি প্রস্তুত হয়ে আসেন নি, বল্লেন, পরে বলবেন। যখন শেষবারের মত তাঁকে সুযোগ দেওয়া হল—তখন তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করে তাঁকে উঠে দাঁড়াতেই হল। সম্মুখে আমেরিকার বিদ্বৎকুলের বিরাট সমাবেশ। মুহূর্তে মনে পড়ল—তিনি বলার কে? যিনি তাঁকে এত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ করে এখানে এনেছেন যা বলবার তিনিই বলাবেন। গুরুস্মরণ করে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সহসা তাঁর মুখ থেকে এক উদাত্ত গম্ভীরবাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল :—

"আমেরিকাবাসী ভাইবোনেরা!"

আন্তরিকতায় ভরা সামান্য একটি সম্ভাষণ : তাতেই শ্রোতাদের হৃদয়ে যে বিস্ফোরণ ঘটল তা অবর্ণনীয়। শ্রোতারা আর কারো মুখে এমন আত্মীয়তার স্বর শোনেন নি। মুহূর্তে তাদের হৃদয় আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠল। এই ছোট একটি সম্বোধন—যা শ্রোতাদের হৃদয় এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল—তার মধ্যে যে শক্তি নিহিত ছিল তা হচ্ছে শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁর সত্যকার একাত্মবোধ—যা আসে ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে : আর ছিল তাঁর গুরুর শক্তি।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ থেকে—সনাতন হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে—তিনি সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লেন :—

"এই সনাতন ধর্ম সকল মানুষকে সমানভাবে দেখে এবং সকল ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ভারত তাই বারবার জগতের উৎপীড়িত বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিজের বুকে নিরাপদ আশ্রয় জুগিয়েছে।"

দু'টি সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা করে বল্লেন—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথযুষাং,,।

নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

"বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্নস্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে মিলিয়ে দেয়, তেমনি হে ভগবান! নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যারা চলছে, তুই ই তাদের সকলের লক্ষ্য"। শ্রী রামকৃষ্ণের ভাষায়—"যত মত তত পথ।" "যে যে ভাবে আমাকে চায়—আমি সেইভাবেই তাকে কৃপা করি। সকলে নিজ নিজ পথে চল্লেও তা আমারই নির্দ্দিষ্ট পথ।" অপরাপর বক্তাদের আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রবল ঢক্কানিনাদের মধ্যে এমন উদারমতের কথা শুনে শ্রোতারা বিস্ময়বিমুগ্ধ। তারপর থেকে আমেরিকার পত্র পত্রিকায় শুধু বিবেকানন্দের স্তুতিগান—জয় জয়াকার।

যাক্—স্মৃতিভারাক্রান্ত মনকে বর্ত্তমানে ফিরিয়ে আনাই শ্রেয়। বর্ত্তমান তা সে যতই অকিঞ্চিৎকর হোক—তার উদগ্র দাবীকে উপেক্ষা করা চলে না। অনিচ্ছুক নয়ন মনকে পথের প্রবাহে শেষ পর্য্যন্ত ফিরিয়ে আনতেই হল।

এদিকে বেলা বাড়ছে;—তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে রাস্তার যানবাহনের ভিড়। শিকাগোর শহরতলিতে এসে পড়েছি। ইচ্ছা করলেই শহরের ভিতর দিয়ে গিয়ে শিকাগো শহরটাকে একচোখে দেখে নেওয়া যেত। কিন্তু এখন যে আবার অফিসের সময়। ট্র্যাফিক

জ্যামের শিকার হবার ইচ্ছা পিণ্টুর নেই। আজ সন্ধ্যার পূর্বেই তাকে সেনডাস্কিতে পৌঁছাতে হবে। আমরা অগত্যা বিবেকানন্দের স্পর্শপূতঃ শিকাগোর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সেনডাস্কির পথ ধরে চল্লাম।

আমরা এবার চলেছি ইলিনয়িস রাজ্যের ভিতর দিয়ে। এই রাজ্য শিল্পে ও বানিজ্যে রীতিমত সমৃদ্ধ। শিকাগো আর তার আশপাশের অঞ্চল বহু কলকারখানা আর বানিজ্য প্রতিষ্ঠানে জমজমাট। বহুদিন থেকেই মিশিগান হ্রদের তীরবর্ত্তী এই শহর সারা বিশ্বে সুপরিচিত। শিকাগো ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চলার পরই আরম্ভ হল আর এক নূতন রাজ্য--ইণ্ডিয়ানা।

আমাদের ৯০ নম্বরের রাজপথ চলেছে এখন ইণ্ডিয়ানা আর মিশিগানের সীমানা ঘেঁষে। দু'পাশের জমির বন্ধুরতা কমে গিয়ে এখন সমতল। গাছপালা ক্ষেতখামার যেমন প্রচুর কলকারখানাও তেমনি অঢেল। কত বিরাট বিরাট ইস্পাত কারখানা এই রাজ্যে।

'সা... ...' পার হবার পর ৮০ নম্বর ও ৯০ নম্বর রাস্তা ... একসাথে মিশে 'ত্রিবেণী সঙ্গম' হল। এ রাস্তায় আরও ... মাইল ... আমরা '...' রাজ্যে প্রবেশ করলাম। ক্রমে 'ওয়াবেসিয়ন্' ও 'মৌমি' পার হয়ে '...' জনপদে এসে পড়লাম। এ রাজ্যের ভূমিও প্রায় সমতল, কোথাও বা সামান্য ঢালু। জমি উর্বর; ক্ষেত খামারও তাই খুব বেশী। তেমনি হাঁস, মুর্গী ও পশুপালনের চলও এখানে খুব বেশী। এবার আমরা 'মৌমি' নদী পার হলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল 'সেনডাস্কি' যেতে যেতে dusk-ই হয়ে যাবে মনে হচ্ছে; কারণ আর ৪২০ মাইল গেলে তবে সেনডাস্কিতে পৌঁছাব।

ঘনঘন রাস্তার মানচিত্র দেখে দেখে, পথ চিনে চিনে, প্রায় ৪২০ মাইল গাড়ী চালিয়ে, পিণ্টু যখন সেনডাস্কিতে বন্ধুভবনে শেষ পর্যান্ত পৌঁছাল, তখন প্রায় ৭ টার কাছাকাছি। সূর্য্যদেব তখনো পাটে বসেন নি।

পিণ্টুর বন্ধু ও বন্ধুপত্নী মধু ও তপতী এতক্ষণ আমাদের আগমনের প্রতীক্ষাতে ঘরবার করছিল। দুই পুরাতন বন্ধুর পুনর্মিলনের দৃশ্য দেখে কি ভালোই না লাগল। পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া মানে তো পুরোনো দিনকে ফিরে পাওয়া।

এ দেশে "কোই হ্যায় বলে চ্যাঁচাবার উপায় নেই। ভৃত্যের মায়না দিতে মনিবকে দেওলিয়া হয়ে যেতে হয়। সুতরাং নিজের কাজ নিজের হাতেই করতে হয়। দুই বন্ধু মিলে বাক্স প্যাঁটারা নামাবার কাজে হাত লাগাল। তপতী নিল আমাদের আপ্যায়নের ভার। আর তপতীর মেয়ে দু'টি ত দৌহিত্রটিকে কোলে নিয়ে চোঁচা দৌড়।

প্রথমেই এক প্রস্থ চা পান, গালগল্প ও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম। অতঃপর গরমজলে স্নান টান সেরে সবাই মিলে নৈশ ভোজন পর্ব সমাধান।

মধু দম্পতীরা উভয়েই দেখতে ভারী সুন্দর; তেমনি সুন্দর তাদের ব্যবহার। মেয়ে দুটি ত যেন সদ্য ফোটা ফুল। আর ভারী মিশুক। বাচ্চাটিকে নিয়ে খেলা করেছে সর্বক্ষণ। তাই বলে ভেবো না আমাদের অবহেলা করেছে। খেলার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই আমাদের খবর নিয়ে গেছে। একবার ত আমাকে চোঁখ বুজে আসন করে বসে থাকতে দেখে দুই বোন আমার পাশে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে বসে ধ্যান ধ্যান খেলা করে গেল। মধুদের তাগিদে আমরা ত রাত ১০ টায় শুয়ে পড়লাম। দুই তরুণ দম্পতী যুগল কত রাত পর্যান্ত আড্ডা দিয়েছিল জানিনা। এক ঘুম দিয়ে উঠেও ওদের কলকণ্ঠ শুনতে পেয়েছি।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সেরে মধুর বসবার ঘরে বসে বড়ে গোলাম আলীর গান শুনলাম ঘণ্টাখানেক। সুদূর উত্তর আমেরিকার ইরিহ্রদের তীরবর্ত্তী সেনডাস্কিতে বসে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের এক স্বর্গীয় পরিবেশ এক লহমায় আমাকে সমুদ্রমেখলা অর্দ্ধপৃথিবী অতিক্রম করিয়ে যেন ভারতমাতার কোলে বসিয়ে দিল।

দুপুরে মধুর আমাদের সবাইকে নিয়ে ইরিহ্রদের তীরবর্ত্তী কিছু কিছু

দ্রস্টব্যস্থান দেখিয়ে নিয়ে আসার কথা। দুপুরের খাওয়াটা একটু সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম।

অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে ইরিহ্রদের তীরে তীরে,—যেমন বাইচ খেলার, মাছ ধরার, চড়ুই ভাতির, পালতোলা নৌকা বিহারের ইত্যাদি ইত্যাদি। ইরি হ্রদের অসংখ্য খাঁড়ি ঢুকে পড়েছে সেনডাস্কি শহরের একেবারে ভিতরে। তাদের উপর দিয়ে লম্বা লম্বা সেতু;—দু'পাশে জলজ ঘাসে ভরা জলাভূমি। সেখানে বহু নৌকার ভিড়। কেউ দাঁড় বাইছে, কেউ পাল তুলে দিয়েছে, কেউ বা নৌকায় বসে গভীর জলে মাছ ধরতে ব্যস্ত। কোথাও গোটাকয় নৌকা পাল গুটিয়ে তীরের কাছে বাঁধা রয়েছে। কেউ বা তীরে বসে বা জলের ধারে পাথরের চাঁই-এর উপর বসে জলে ছিপ ফেলে মাছের ধ্যানে মগ্ন। আবার কোথাও বা গেঞ্জি গায়ে বা খালি গায়ে নানা বয়সের ছেলেবুড়ো মেয়ে মদ্দা 'জগিং' করে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ কিনা স্বাস্থ্যরক্ষার্থে দৌড়াচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে এদেশের লোকদের স্বাস্থ্যসচেতনতাও যেমন, গরম গরম বাতিকও তেমনি প্রবল। কোনক্রমে শাইন বাঁচিয়ে স্বল্পবাসে সজ্জিত (?) হয়ে এরা নির্দ্বিধায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান।

ইরি হ্রদের পাড়ে পাড়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এসব দেখার পর মধু একটা জায়গায় এসে গাড়ী থামাল। নেমে দেখি—এ যে একটা বিরাট চড়ুই ভাতির জায়গা। একদিকে দিগন্তবিস্তৃত ইরি হ্রদ, তার জলে প্রতিবিম্বিত ক্যানেডার নীল আকাশ, আর অন্যদিকে হ্রদের গা ঘেঁষে পাইন, সিডার, ওক, সিলভার এ্যাস্ প্রভৃতি বনবৃক্ষের ছায়ায় ঝিমানো সবুজঘাসে ভরা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। জায়গায় জায়গায় বসার জন্য কাঠের চেয়ার টেবিল, পাইন গাছ চেরা কাঠে তৈরী,—পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে ঘন সবুজ রংকরা কাছাকাছি রয়েছে একাধিক লোহার উনুন—যেখানে কাঠ বা কাঠ কয়লা জ্বালিয়ে মাংস পুড়িয়ে—থুড়ি-রোস্ট করে রুটিও অন্যান্য খাদ্য পানীয় সহযোগে অতি উত্তমরূপে চড়ুই ভাতি করা যেতে পারে। বহু লোক এই বাসনায় এখানে এসে

থাকেন। চড়ুই ভাতি রত ২/৪টি আমেরিকান পরিবারকে দেখতে পেলাম,—মা বাবা সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আর বাস্কেটভর্তি রুটি-মাংস ও নানা খাদ্যপানীয়ের সম্ভার। হ্রদের গা ঘেঁষে একটা রাস্তা; এখানে যানবাহনের প্রবেশ নিষেধ, শুধু বেড়িয়ে বেড়াবার জন্য পায়ে চলা পথ এটা। রাস্তা পার হলেই একটা জেটি। সেখানে হ্রদের জলের ঢেউ ভাঙ্গার একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। বহুলোক সেখানে মাছ ধরছে।

একটি মৎস্য শিকারীর প্রতি দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল। তার বঁড়শিতে সে দিন প্রচুর মাছ উঠছিল। তিনি কিন্তু মাছ ধরেই তৎক্ষণাৎ জলে ছেড়ে দিচ্ছিলেন। নেহাত খুব বড় সড় হলে কাঁটা তুলে রেখে তারপর জলে ছেড়ে দিচ্ছিলেন। এ যেন অনেকটা 'পথের দাবীর' সব্যসাচী-সুলভ আচরণ—যিনি গাঁজার কলকে পরম যত্নে সেজে দেন নিজে খান না। দেখে আমরা ত অবাক। এ হেন অহিংস মৎস্য-শিকারের রহস্যটা কি?

পিন্টুর আবার মাছ ধরার খুব শখ। তাই চটপট ওদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়ে রহস্যটা উদ্ধার করে আনল। এখানকার মাছে নাকি বড়ই বেশী কাঁটা। এঁরা আবার কাঁটাওয়ালা মাছের কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে নিতান্তই নারাজ। তাই এহেন অহিংস আচরণ। এ দেশের সবাই কিন্তু মৎস্যবিলাসী নয়। উইসকনসিনের লোকেরা নাকি মাছের ধারে কাছেও যায় না। জার্মান বংশোদ্ভব কিনা। তাই আলু ও মাংসের প্রতি অসীম অনুরাগ। তবে শুনেছি,—ইটালীয় বংশোদ্ভব এবং টেক্সাসের আমেরিকানরা নাকি খুবই মৎস্যপ্রিয়।

জেটিতে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে সহিংস এবং অহিংস মৎস্য শিকারীদের মাছ ধরার দৃশ্য উপভোগান্তে পুনঃ মধুর গাড়ীতে সমাসীন হলাম। গাড়ী এবার ইরি হ্রদের তীরে তীরে নানা নয়ন নন্দন দৃশ্য, পথের মধ্যে বিচরণ করতে করতে একটা জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সামনে বিস্তীর্ণ ইরির নিস্তরঙ্গ জল,—তীরে তীরে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। মাঝে মাঝে নানা বিচিত্র গাছ-পালা। আমাদের সামনে একটা বাঁধা ঘাট,—সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে জল পর্যন্ত নেমে গেছে,—উপরে ছাদ দেওয়া। ভিতরে সারি সারি অমসৃণ কাষ্ঠাসন। গাড়ী থেকে নেমে সবাই মিলে ঘাটে এসে বসা হল।

কী সুন্দর—কী প্রশান্ত পরিবেশ। একদিকে দিগন্তেক্ষণ তটরেখা,—অন্যদিকে কূলহীন ইরিহ্রদের জলের আয়নায় ক্যানেডার আকাশ মুখ দেখছে। এ জায়গাটায় জলে নেমে অবগাহন বা সন্তরণ বারণ: অন্ততঃ সাইনবোর্ডে তাই ত লেখা রয়েছে। তবুও স্নানার্থী কেউ কেউ যে আসছেন না তা ও নয়। মানব চরিত্র সর্বত্রই সমান দেখছি, হের ফের ১৯/২০ না হলে ও ১৫/২০ মাত্র। আমাদের দেশে আইন অমান্য করাটাই বর্তমানের অলিখিত আইন। যদিও মুষ্টিমেয় কিছু লোক এখনো আইনানুগ। এদেশের মানুষ প্রখর আইনসচেতন হলেও কেউ কেউ মধ্যে মধ্যে সুযোগ পেলে আইন লঙ্ঘন করে থাকেন,—তা ত খালি চোখেই মালুম হচ্ছে।

ফেরার পথে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ দেখে সবাই গাড়ী থেকে নেমে কিছু আইসক্রিম খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিলাম। তারপর আরও কিছুক্ষণ সমুদ্রনিভ ইরি হ্রদের পারে পারে নানা নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে বেড়ালাম।

এবার বাড়ী ফেরার পালা। ফিরবার পথও কী সুন্দর! ইরি-হ্রদের নানা নাব্য খাড়ির উপরের সেতুগুলি পার হচ্ছি আর দেখছি—দুধারে অসংখ্য নৌকা, জলের ধারে লম্বা লম্বা ঘাসের উপর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে। কেউ বা জলের ধারে গাছের ছায়ায় আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে শুয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছেন। একটা ছুটি ছুটি ভাব,—একটা তন্দ্রাজড়ান মন্থরতা—হ্রদের কূলে কূলে ছড়িয়ে আছে। আকাশ জল, ডাঙ্গা আর বিচিত্র গাছপালায় বিরচিত চিত্রনিভ দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়ে

চক্কর কাটতে কাটতে গাড়ীটা অবশেষে মধুদের বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে থামল।

অতঃপর অবতরণ, ক্ষণিক বিশ্রাম, ধূমায়িত চায়ের বাটি হাতে যথারীতি স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাদি চল্ল কিছুক্ষণ।

খাবার টেবিলে বসে যখন সেনডাস্কি আর ইরির অনুপম সৌন্দর্য্যের আর মনোরম আবহাওয়ার সুখ্যাতি করছিলাম তখন মধুর মুখে শুনলাম বর্তমান চিরবসন্তের আবহাওয়া দেখে সেনডাস্কির প্রকৃত আবহাওয়া বোঝা যাবে না। জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি এখানকার তাপাঙ্ক ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট স্পর্শ করে। তখন ত বেশ গরম। মৌসুমী বায়ুর দেশ এটা নয়। বর্ষা বলে আলাদা চিহ্নিত ঋতু এখানে নেই। "বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর"--যখন তখন। গ্রীষ্মে আকাশ ঝরায় জল, আর শীতে ঝরায় তুলোর মত বরফ। তখন প্রচুর বরফপাত হয় এখানে, তাপাঙ্ক তখন শূন্য ডিগ্রির নীচে,—কখনো বা ১০/১৫ ডিগ্রি নীচে। তাতেও রক্ষা নেই,—"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।"

যখন উত্তর মেরু থেকে মাঝে মাঝে তীব্র হিমেল হাওয়া বয়, তখন স্থানীয় অধিবাসীরাও নাকি পিতৃনাম বিস্মৃত হয়ে যান।

তবে এখানকার অক্টোবর নাকি অতি সুন্দর,—এ জায়গার পক্ষে তা একটি নয়—'Octo' বর সদৃশ।

শীতে পাতা ঝরে যাবার পূর্বে অক্টোবরের মেপল বনে যখন লোহিত লাবণ্যের বিচিত্র সমারোহ—ঈষৎ হরিদ্রাভ থেকে জরদ, তার থেকে ফিকে লাল, তার থেকে গাঢ়, গাঢ় থেকে গাঢ়তর লোহিতের বর্ণাঢ্য বিন্যাস, তখনকার সে অবর্ণনায় সৌন্দর্য্য নাকি কল্পনাকেও হার মানায়। আশ্চর্য্য কি এখানে মেপল পাতা নিয়ে এত মাতামাতি। কাশ্মীরীদের 'চেনার' পাগলামীও-এর কাছে তুচ্ছ। মেপল পাতার বাহার নিয়ে এতটা গর্ব যে কানেডার জাতীয় পতাকা পর্যন্ত রক্তিম মেপলপত্র-লাঞ্ছন।

সেপ্টেম্বরে দেশে ফিরছি,—তাই পাতাঝরার রঙের খেলা চোখে দেখা হবে না। অবশ্য ক্যানেডার এক শিল্প সংগ্রহশালায় 'ফল' অর্থাৎ অক্টোবরের বনভূমির অপূর্ব সব ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম,—লোকসান তাতে কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছিলাম,—সে কথা যথাস্থানে বলা হবে।

মধুর মুখে এও শোনা গেল যে এখানকার শীত দুঃসহ হলেও নয়ন-বিমোহন। নিরাবরণ নিরাভরণ কাননভূমিতে যখন তুষারপাত হয়,—শূন্য ডালে ডালে, জমিতে পেঁজা তুলার মত বরফ লেগে থাকে,—বরফের চাপে চিরহরিৎ পাইনের শাখাপ্রশাখা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে,—তার উপর যখন চাঁদের আলো ঝরে পড়ে, তখন নাকি এ দেশ নিছক রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরী, পরীর দেশ।

মধ্য এপ্রিলে আবার এক নাটকীয় পরিবর্তন আসে। জমা তুষার গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে ধূসর মৃত্তিকায় সবুজের বন্যা নামে, আর ডালে ডালে তখন কাঁচা সবুজ কচি কিশলয়ের ভিড়।

মধুর মুখে এসব বর্ণনা শুনছি আর মনে হচ্ছে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি।

ভগ্নদূতের মত পিন্টু স্মরণ করিয়ে দিল—কাল সকালেই নিউজার্সি রওয়ানা হতে হবে; সুতরাং এখনি গোছগাছ করে নেওয়া ভাল। স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠে বল্লাম—'তথাস্তু'।

[নিউজার্সির পথে—এলিঘেণী ও পকোনো পর্ব্বতশ্রেণী]

চেরী হিলস্, নিউজার্সি

১০ই মে, ১৯৮০ইং

প্রাতঃরাশপর্ব দ্রুত চুকিয়ে নেওয়া হল। মধু ও তপতীকে সধন্যবাদ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বাচ্চা দু'টিকে শেষবারের মত আদর করে সকালে ৮টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। বিলম্ব করার উপায় নেই। —সন্ধ্যার পূর্বেই নিউজার্সি পৌঁছাতে হবে।

"নাই নাই নাই যে সময়।"

বিদায় সেনডাস্কি! বিদায় সুন্দরী ইরি! বিশ্বাস করো—দিনান্তে নিশান্তে তোমাদের 'পথপ্রান্তে' ফেলে যাচ্ছিনা; হৃদয়ের গভীরে তোমাদের চির জাগ্রত স্মৃতি সযত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের গাড়ী 'ওহাইও টার্ণ পাইক' ধরে চলতে লাগল। এখানেও রয়েছে গবাদি পশু, গম, পশুখাদ্য প্রভৃতির প্রাচুর্য্য এবং নানা বানিজ্য প্রতিষ্ঠান। চারপাশের গাছপালায় ঘন সবুজের আলিম্পন। মাঠঘাট যেমনি ঢেউ খেলান, তেমনি রয়েছে ক্ষেতখামার আর বনজঙ্গলের প্রাচুর্য্য। আমাদের গাড়ী চলেছে 'ইলিরিয়া'কে পাশে রেখে, 'ওয়ারেন' হয়ে 'শেরণ'কে বিস্মরণ না করে তার কোল ঘেঁষে। এই 'শেরণ' ছাড়ালেই শুরু হবে 'পেনসিলভেনিয়া' রাজ্য যেখানে রয়েছে বন, পাহাড় ও নদীর এক অপূর্ব সমাবেশ। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা বৈষয়িক দিক থেকেই নয়,—আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসেও এ অঞ্চলের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

পিণ্টু এ অঞ্চলে অনেক দিন ছিল। তাকে বল্লাম 'পেনসিলভেনিয়া' সম্বন্ধে কিছু বলতে। তাতে সবার দেখাটা আরও ভালভাবে জমবে। বক্তার ভূমিকা নিতে পিণ্টু নারাজ। উল্টে মিতাকে বল্ল—"ইতিহাসের

ছাত্রী ত তুমি, সুতরাং বলার অধিকার তোমারই সব থেকে বেশী। মিতাও রাজী নয়; জবাব দিল—"বারে! এমন কথা ত ছিল না। আমি কি তৈরী হয়ে এসেছি,—না গাইডগিরি আমার পেশা? তা ছাড়া বক্তৃতা যে দেব বাচ্চটা সামলাবে কে?

উভয় পক্ষের যুক্তিই অকাট্য। অগত্যা গৃহিণীর জ্ঞাতার্থে "অব্যাপারেষু ব্যাপারং"এর ভার আমাকেই নিতে হল। পেনসিলভেনিয়া সম্বন্ধে আগেই মোটামুটি জেনে নিয়েছিলাম।

জার্ম্মান ঔপনিবেশিকদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমেই এই অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে একদা গড়ে উঠেছিল পেনসিলভেনিয়ার উপনিবেশ। এখান 'মেরিল্যাণ্ড' ও 'সাস্কুয়েহান্না' নদীর মাঝখানকার জায়গাটাতে একদল জার্ম্মান প্রথমে বসবাস শুরু করেছিল। প্রথমে এদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মপালন। পরে এখানে গড়ে উঠল এক বিরাট কৃষি উপনিবেশ। সেটা সম্ভব হয়েছিল তাদেরই কঠোর পরিশ্রমের ফলে। প্রকৃতিতে এরা খুবই স্বাধীনচেতা। ইংলণ্ডের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ শুরু হয় তার সূত্রপাতও হয়েছিল এখানকার ফিলাডেলফিয়া শহরে।

আমাদের যেমন ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস, তেমনি আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস হল ৪ঠা জুলাই। ১৭৭৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, এবং সেটা করা হয় এই ফিলাডেলফিয়া শহর থেকেই। আমেরিকার সংবিধান প্রণয়ন করা হল ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে এবং তাও করা হয়েছিল এইখানে।

পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে উইলিয়াম পেনএর বিরাট অবদান। একবার কি একটা সুযোগে তিনি ইংলণ্ডের রাজা 'দ্বিতীয় চার্লস' এর কাছ থেকে কিছুটা জমি পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি এখানে এক আদর্শ নগরী স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। —সেখানে থাকবে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার। কালে পেন-প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম হল ফিলাডেলফিয়া—

গ্রীক ভাষায় যার অর্থ ভ্রাতৃপ্রেমের নগরী। এই পেন্‌সিলভেনিয়া রাজ্যের নামকরণও হল এই 'উইলিয়াম পেন,' এর নামানুসারে। স্বাধীনতা যুদ্ধের কতই না ধকল গেছে এই শহরের উপর দিয়ে। এই শহরই ছিল আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম রাজধানী। পরে অবশ্য রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল ওয়াশিংটনে তবুও একথা না মেনে উপায় নেই —পূর্ব্বের গৌরব না থাকলেও শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি,বানিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই নগরী এখনও নগন্য নয়।

"এবে বুড়া তবু গুঁড়া কিছু আছে বাকী।"

বক্তৃতা বন্ধ করে দেখি—শ্রোতারা অন্যমনস্ক,—বক্তৃতা কেউ শুনছে না। অতএব মুখ বন্ধ করে পথের দিক চোখ খোলা রেখে বসে রইলাম। এদিকে আমাদের গাড়ী ইতিমধ্যে 'মার্সার' অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। দু' পাশে আন্দোলিত প্রান্তর; বনানী কোথাও গভীর, কোথাও বা অনিবিড়;—কোথাও খনির কাজ চলছে। তাই বলে ভেবোনা যে এ অঞ্চল একেবারে ক্ষেত খামার বিবর্জ্জিত। কৃষি এবং শিল্প—দুটো ব্যাপারেই এ রাজ্য সমৃদ্ধ;—কাশীর ঘরাণা তবলের মত —ডাইনা বাঁয়া—দুটোই বাজে সমান দাপটে।

'মার্সার'এর পর থেকেই 'এলঘেনি' পর্বতশ্রেণীর একাংশ ভেদ করে আমাদের পথ পথের দু'ধারে বার্চ্চ, পাইন, ওক, সিডার, আর ও কত নাম না জানা তরুশ্রেণী। চিরহরিৎ পাইন অরণ্যের মাঝখানে কোথাও বা একটা শুকনো গাছ দাঁড়িয়ে আছে;—ডালপালা শুকিয়ে ঘোর বাদামী-রং-এর। তাতে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব সৌন্দর্য। দু'পাশে সবুজে মণ্ডিত এলিঘেনি পর্বতশ্রেণী। তার মাঝখান দিয়ে সর্পিল পথ কখনো ঢালু হয়ে নামছে, কোথাও বা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে নীল আকাশে,—সেইখানে যেন পথের শেষ। সুনীল আকাশে পুঞ্জীভূত সাদা সাদা মেঘ। পৃথিবী বিখ্যাত বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গের আজীবন সাধনার ও অভিজ্ঞতার ফল যেমন গ্রন্থাগারে ধূলির আবরণে ঢাকা থাকে উপযুক্ত গুণগ্রাহী পাঠকের প্রতীক্ষায়—তেমনি রয়েছে এই

এখানে নিঃশব্দ নির্জ্জনাবৃতা কতই না শ্বাসরোধকারী সৌন্দর্য্য রসিকজনের নয়নপাতের অপেক্ষায় যুগযুগ ধরে রাস্তার বাঁকে বাঁকে।

কিছুক্ষণ পর খরস্রোতা এলিঘেনি নদীর ব্রীজ পার হয়ে চল্লাম। বাঁকেবাঁকে কতই না 'নবনব রূপে' প্রকৃতি দেবী নয়নমন হরণ করে চলেছেন!

প্রতি দু'ঘন্টা অন্তরই 'বিশ্রাম স্থান'-এ নেমে গাড়ীর এবং নিজেদের উদরে উপযুক্ত খাদ্য পানীয় ভরে নেওয়া হচ্ছে। এই সুন্দর পরিবেশে নিজেরাও কিছুটা হাঁটছি, বাচ্চা দৌহিত্র দেবকেও হাঁটাচ্ছি; কী ভালই যে লাগছে! বাতাস এখানে সর্বদাই বেশ প্রবল, জায়গাটাও বেশ উঁচু। এই মধ্য মে মাসেও একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব্।

'দরিয়স' ও 'ক্লিয়ারটাউন' clear করে, 'বেল্লেফন্তে'কে ফন্তে করে অর্থাৎ এক্ষেত্রে পেছনে ফেলে রাস্তা এগিয়ে চলেছে; কখনো বা এলিঘেনি পর্বত ভেদ করে, কখনো সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে। রাস্তার দু'পাশে চলেছে নবনব নয়ন-নন্দন দৃশ্যের নব নব আশ্চর্য্যের মিছিল। 'মিলটন' জনপদের কাছাকাছি এসে মনে হল—এই ত স্বর্গ পেলাম "Paradise regained?"

আর একটু পরে 'সাস্কুয়েহান্না' নদীর একটি ছোট উপনদী পার হলাম। জায়গায় জায়গায় সাইন বোর্ড,—তাতে লেখা "Deer Xing"। Deer ত বুঝলাম; কিন্তু Xing টা কি বস্তু। ওঃ এটা Crossing-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তা হলে নির্গলিতার্থ দাঁড়াল এই যে "সাবধান! হরিণ এ রাস্তা পারাপার করে থাকে।"

আমেরিকার তুষার অঞ্চলে ও তার কিঞ্চিৎ দক্ষিণবর্ত্তী অঞ্চলের পাইন অরণ্যে 'মুজ' নামক বন্যহরিণের বৃহৎ আয়তনের এক প্রজাতি অনেক দেখা যায়। তবে এ অঞ্চলে 'মুজ'দের দেখা পাবার ত কথা নয়।

কিন্তু মুজ ছাড়া অন্য প্রজাতির হরিণ কি থাকতে নেই? অন্যান্য জাতের বন্যহরিণ নিশ্চয়ই এসব রাস্তা হামেসা পার হয়ে থাকে। যাতে বেপরোয়া মোটর চালক এদের পিষ্ট না করেন—এরই জন্য এই সাবধান

বাণী। ছোটখাট লোমশ জানোয়ারের পিষ্টদেহ এ রাস্তায় বহু স্থানেই দেখতে পেয়েছি।

ঢালু পাহাড়ের গায়ে কোথাও গাছপালা কেটে নেওয়া। যেন সবুজ চুলে বাদামীসিঁথি। হয়ত বৃষ্টি হলে এসব রাস্তা দিয়ে জল নামে। এগুলিকেই মনে হচ্ছে একটু গড়েপিটে শীতের সময় 'শী' (Ski) খেলবার জায়গা তৈরী করা হয়ে থাকে। শীতে বরফপাত হয় প্রচুর আর তাপাঙ্কও তখন হিমাঙ্কের বহু নীচে চলে যায়। তখন পাহাড়ের গাছ কেটে পরিস্কার করা এই ঢালুগুলি কঠিন বরফে আবৃত হয়ে 'শী' খেলার তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। ঘনসবুজ বনানী, নীলাভ পাহাড়, ফেনশুভ্রা স্রোতস্বিনী, সুনীল আকাশ আর পুঞ্জপুঞ্জ মেঘদিয়ে গড়া এক স্বপ্নের রাজ্য পেরিয়ে গাড়ী এখন ৮০ নম্বরের রাজমার্গ ধরে পূর্বাভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

'মিফ্‌লিন্‌ভিলে'র কাছে এসে 'সাস্‌কুয়েহান্না' নদী পার হলাম। সবুজে সুনীলে বিরচিত নগনদঅরণ্যানী শোভিত নিসর্গ ভেদ করে আমাদের রাস্তা চলেছে; দু চোখ ভরে আমরা সবাই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করে চলেছি।

এলিঘেনি পর্বতের একাধিক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আমরা এসেছি। সুড়ঙ্গপথে রেলভ্রমণের সুযোগ ভারতেও যথেষ্ট রয়েছে। পুণে থেকে বোম্বাই অথবা গৌহাটী থেকে শিলচর যেতে অনুরূপ সুড়ঙ্গ অনেকগুলিই পড়ে। তাই বলে এ অভিজ্ঞতাকে খাটো করে দেখছি না।

এবার এলিঘেনি পর্ব্বতের মোহজাল কাটিয়ে পথ পাকিয়ে পাকিয়ে এসে ঢুকল 'পকানো,' পর্ব্বতের পশ্চিমপ্রান্তে। এ পর্ব্বতের দৃশ্যাবলীর স্বাদ একটু আলাদা। পর্ব্বতশীর্ষ মণ্ডলাকৃতি, সানুদেশ [illegible]নিবিড় বনানী পরিশোভিত,—একটু গড়ান প্রকৃতির।

স্থানে স্থানে দুই পাহাড়ের মাঝখানে নীল আকাশের স্নিগ্ধ অবকাশ; [illegible] শুভ্রহাস্যের মত পুঞ্জপুঞ্জ সাদা মেঘ। আবার কোথাও মূর্ত্তিমান

গত্তের মত পাথর কেটে,—পাথর চূর্ণ করে খনির কাজও চলছে। তবে এখানেও রয়েছে বিষম গতিতে এগিয়ে যাওয়া কালনাগিণীর মত সর্পিল সরণী। কোথাও সে ঢালু হয়ে রসাতলগমিনী ;—আবার কোথাও বা আকাশচুম্বী ;—দুই দিকে অকৃপণ হরিৎলাবণ্য।

'এলব্রাইটভিলে' পার হয়ে 'লেহাইটন'কে পাশে রেখে "লেহাই ভেলি টানেলে" উপস্থিত হলাম। পথের দু'পাশে তেমনি সবুজের সমারোহ। 'এলেন টাউন' অচিরেই আমাদের সামনে চলে এলেন। তাকে অতিক্রম করে 'সেন্টারভেলি' পার হয়ে আমরা 'লেন্সডেল'এ চলে এলাম। এই ৭৬ নম্বর রাজপথ ধরে এবার ফিলাডেলফিয়ার সামানায়। 'স্কুইলকিল' নদীর পাশ ঘেঁষে খানিকটা গিয়েই আমরা অবশেষে এসে পড়লাম ফিলাডেলফিয়ার ডাউন টাউন অঞ্চল অর্থাৎ ব্যবসায় কেন্দ্রে। এবার স্কুইলকিল নদীর ব্রীজ পার হলাম। কিছুক্ষণ পর ভেটার্নস্ ষ্টেডিয়াম পার হয়ে 'ডেলওয়ারে' নদীর ব্রীজের কাছে এসে গেলাম। এই ব্রীজের নাম 'ওয়াল্টহুইটমেন ব্রীজ'। এর এক তীরে পেনসিলভেনিয়ার অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়া আর অন্য তীরে হল নিউজার্সি রাজ্যের আরম্ভ।

শহরের ভিতর দিয়েই যাচ্ছি। রেলওয়ে ষ্টেশান, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য ছোটখাট দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পিন্টু গাড়ী চালাতে চালাতেই আমাদের দেখিয়ে দিল। প্রবাস জীবনের প্রথম দিকটা ফিলাডেলফিয়া ও নিউজার্সিতে কেটেছে বলে সে এ জায়গাটা খুব ভাল করে চেনে। এ দেশে এসে পড়াশুনা ও এখানেই করেছে। খুব বড় শহর এটা। তবুও খোদ শহরের অফিসপাড়া বা ব্যবসায় অঞ্চল বাদ দিলে এটা যে এত বড় শহর তা বুঝতে পারাই কঠিন। এই ঐতিহ্যপূর্ণ শহরের শহরতলি অঞ্চলে এখনো আরণ্যমায়া জড়িয়ে আছে। শহরতলির মধ্যযুগীয় প্রাচীন অট্টালিকা দেখে মনেই হয় না এটা বিংশ শতাব্দীর অস্তিমলগ্ন।

এক জায়গায় দেখতে পেলাম আমাদের দেশের মত ঘোড়ার গাড়ী। এক মেম সাহেব গাড়ীটি চালাচ্ছেন। মেয়েরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ

চালাচ্ছেন আজকাল ;। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী চালাচ্ছেন ! ঠিক এই মূর্ত্তিতে তাঁদের দেখেছি বলে মনে ত পড়ে না। তবে এতে আশ্চর্য্য হবার ই বা কি আছে ? সংসাররূপ গর্দভবাহিত যান চিরকাল ত মেয়েরাই অবলীলাক্রমে চালিয়ে এসেছেন ;—যদিও আমরা তাঁদের "পরিচালিকা" বল্লে তারা অভিমানভরে বলে থাকেন—"পরিচালিকা না ছাই,—বল পরিচারিকা ।"

থাক্‌গে—ওয়াল্ট হুইটমেন ব্রীজ পার হয়ে অবশেষে আমরা নিউজার্সি রাজ্যে প্রবেশ করলাম। দু'ধারে অজস্র গাছ আর ঘাসভর্ত্তি ঢালু ভূমিতে অজস্র বণকুসুমসম্ভার। 'চেরীহিল' এ পিন্টুর দাদা মিন্টুদের বাড়ী যখন গাড়ী পৌছাল তখন ৭॥. টা বাজলেও সূর্য্যাস্ত হয়নি। মিন্টুর স্ত্রী ঝুলন দোর খুলে তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। ততক্ষণে দুই ভাই মিলে গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাড়ীতে বয়ে নিয়ে গিয়েছে।

আজ পিন্টু আর মিতা মিলে প্রায় ৫২৫ মাইল গাড়ী চালিয়েছে। বিশ্রামের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তাদের। স্নানাহারের পর পিন্টুকে বল্লাম—কাল পূর্ণ বিশ্রাম নাও। কিন্তু সে রাজী নয় ;-তার বক্তব্য—ফিলাডেলফিয়ার দর্শণীয় স্থানগুলি কাল ছাড়া দেখার সময় নেই। তা ছাড়া তার যে দুই দিদি ফিলাডেলফিয়া থাকেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। পরশু আবার ওয়াসিংটনে যাবার কথা এবং পরদিন নিউইয়র্ক হয়ে বারহারবার। সুতরাং সময় কোথায় ?

অকাট্যযুক্তি; কথা না বাড়িয়ে পিন্টুর কথা মেনে নিয়ে ঘুমাতে চলে গেলাম এবং পথের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্মৃতির মানসিক রোমন্থন করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম—

—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেন সংস্থিতা'—
তাঁরই কোলে।



[ফিলাডেলফিয়া পর্ব]

চেরী হিলস্, নিউজার্সি

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি নিদ্রাভঙ্গ হলেও একটু গা এলিয়ে নিত্যকর্মাদি শেষ করা গেল। কারণ আমরা আজ দুপুরের আগে বার হচ্ছি না। এটুকুর মতলব দুপুরের খাওয়া একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে আমরা নিউজার্সির কিছুটা দেখে নিয়ে তারপর ফিলাডেল-ফিয়া দেখতে যাব।

দুপুরের খাওয়ার পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। পথঘাট আর পাহাড়ের সানুদেশে ঘাসের সবুজ মলমল বিছান। তবে মধ্য এপ্রিলে পালটান নিউজার্সির নিউ জার্সিটার কাঁচা সবুজ রং একটু গাঢ় হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। গাড়ীর গবাক্ষে চোখ মেলে বসে আছি ;—দেখছি আর ভাবছি—ধন্য আমি।

গৃহিণীর তীক্ষ্ণপ্রশ্নে সেই সম্মোহিত ভাব কেটে গেল। তিনি বল্লেন—"সে দিন ত খুব ফিলাডেলফিয়া নিয়ে বক্তৃতা দিলে। নিউজার্সি-সম্বন্ধে কিছু নয়। কথা শুনাও ত বুঝি কত বিদ্যে তোমার ঘটে।"

স্বীকার করতেই হল—নিউজার্সি সম্বন্ধে নবনব তথ্যাদি সমৃদ্ধ বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সামান্য যা জানি অভয় পেলে সুরু করতে পারি। বৃথা ভনিতা বর্জ্জন করে আরম্ভ করবার অভয়-বাণী সভয়ে লাভ করে বক্তৃতা সুরু করলাম :—

নিউজার্সি কিছু হেলাফেলার জায়গা নয়। ফিলাডেলফিয়ার মত নিউজার্সিরও নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে,—রয়েছে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রায় অনুরূপ অবদান। এ রাজ্যের ভূপ্রকৃতিই বা কত বিচিত্র! 'কিট্টাটিন্নে' পর্বত আর এপেল্লা পর্ব্বতমালা থেকে সুরু আর আটলান্টিকের বেলাভূমিতে গিয়ে এ রাজ্যের শেষ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিধ্বংসী ভূমিকম্প, তুষারযুগের হিমবাহ আর অতিবর্ষণবাহিত বালুপাথর মিলে এই রাজ্যের এই বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি গড়ে তুলছে।

এই ত গেল ভূপ্রকৃতির কথা; এবার এ রাজ্যের মানবপ্রকৃতির কথায় আসছি। এ রাজ্যের লোকদের চরিত্র কিরকম দৃঢ় তার পরিচয় পাবে এই কথা থেকে:—স্বাধীনতার যুদ্ধে এরা চার চার বার কন্টিনেণ্টাল আর্মির পদানত হয়েছেন, তবুও লড়াই করে লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছেন প্রত্যেকবার। ওয়াসিংটনের শীতকালীন প্রধান সৈন্যাবাস ছিল এই রাজ্যের অন্তর্গত মরিস টাউনে এক দুর্দ্দান্ত শীতের রাত্রে ফিলাডেলফিয়ার শহরতলি 'ভেলিফোর্জ' এর সৈন্যাবাস থেকে ওয়াসিংটন বেরিয়ে এলেন;—এবং তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে হিমে জমে যাওয়া ডেলওয়ারে নদী পার হয়ে শত্রুসৈন্যকে অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করলেন। এই যুদ্ধজয়ের ফলেই আমেরিকার স্বাধীনতালাভ সম্ভব হয়েছিল। ভাগ্যনির্দ্ধারণকারী এই যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল জান? তা এই রাজ্যেরই অন্তর্গত প্রিন্সেসটনএ সুতরাং দেখতে পাচ্ছ স্বাধীনতার যুদ্ধেও এ রাজ্যের অবদান কিছু কম নয়।

ভূপ্রকৃতির মত সভ্যতার বৈচিত্র্যও রয়েছে এ রাজ্যে প্রচুর। এখানে যেমন দেখবে সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল, ক্যাসিনো কালচার আর প্রমোদনগরীর ছড়াছড়ি—তেমনি দেখবে কৃষি ও পশুপালনের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল সমাজ। আবার এ রাজ্যের বালুকাপ্রস্তরসঙ্কুল ঊষর পাইন অরণ্য 'পাইন বেরেনস্'এ এমন সব আদিম অধিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে যারা এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও বর্ত্তমান সভ্যতাকে সর্ব্বতঃ বর্জ্জন করেও দিব্যি বেঁচে বর্ত্তে রয়েছে।

গৃহিণীর ধৈর্য্যের সীমা এতক্ষণে বোধ হয় অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে। নিতান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে তিনি বল্লেন—"যথেষ্ট হয়েছে, পরম আপ্যায়িত হলাম, দয়া করে এবার থাম।"

নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম—বাছাধন।
"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

পাণিগ্রহণ যখন করেছিলে তখন ভাবনি কেন যে গৃহীতপাণিটি সর্বদা মধুররসসিক্ত পানিই যে দেবেন তার কিছু স্থিরতা নেই; কটুকষায় পানিও প্রদান করতে পারেন। পাণিপীড়ন বল্লেও পীড়ন থেকে নিষ্কৃতি নেই;—পা কেন মনকে পীড়ন করলেও উদ্বাহবন্ধনেবদ্ধজীব ত উদ্বাহুবন্ধনে বদ্ধ, এক মাত্র উদ্বন্ধন ছাড়া তার মুক্তি নেই।

অগত্যা মুখে কুলুপ এঁটে চোখ ছ'টা খুলে রাখলাম।

সময়ের স্বল্পতা হেতু নিউজার্সির কোনো বিশেষ জায়গায় আজ আমরা যাচ্ছি না। অলিগলি ঘুরে শহরটাকে দেখব যাতে এ শহর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়।

পিণ্টুর গাড়ী এগলি ওগলি করতে করতে শহর পরিক্রমা করতে লাগল। দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি,—শহরতলিতেও কেমন ঝকঝকে তকতকে রাস্তা ঘাট, ঢেউখেলান ঘাসভর্ত্তি মাঠ; কোথাও বা বন্য ঘাসের নানাবর্ণের ফুল,—পাইন, বার্চ্চ, সিডার, মেপল, ওকের ছায়ায় ঝিমানো ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ী, আর রাস্তার ছ'পাশে বনকুসুমের অজস্র সম্ভার।

পিণ্টু প্রস্তাব পেশ করল—'এবার চলুন, কাছেপিঠের একটা সুন্দর জায়গায় বেরিয়ে আসি।' সুন্দর জায়গা দেখতেই ত আসা, এতে কারো আপত্তি থাকার কথাই নয়। আমরা এবার ডেলওয়ারে নদীর উপরে হুইটমেন ব্রীজ পার হয়ে চল্লাম—স্কুইল নদীর পারে বিখ্যাত ইষ্টরিভার ড্রাইভএর দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছালাম এক মায়াময় পরীর রাজ্যে,—যেখানে সুপ্রাচীন ওক, সিডার, পাইন, পপলার আর মেপলের কুঞ্জ নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের অলস বেলায় রৌদ্রে পিঠ দিয়ে ঝিমাচ্ছে।

রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি আঁকাবাঁকা সর্পিলগামিনী

নদী প্রখরস্রোতা প্রবাহিনী। দুই তীরের প্রাচীন বৃক্ষরাজি তন্বী নদীটিকে যেন গভীর স্নেহে আগলে রেখেছে।

নদীর কালোজলে আর সবুজ ছায়ায় মেশামিশি,—কোথাও বা প্রতিবিম্বিত নীল আকাশ, যেন রূপকথার রাজ্য থেকে সদ্য আমদানী করা। কী শান্ত, কী স্নিগ্ধ পরিবেশ। বিংশ শতাব্দীর প্রান্তিক লগ্নের আধুনিকতম রাজ্য আমেরিকা, তারই এক বিখ্যাত শহরের গায়ে এমন স্নিগ্ধ পরিবেশ, এমন কালোজলের আয়নায় মুখ-দেখা ঝিমানো দুপুরের অবকাশ,—এমন শান্তির নীড়! এ যে কল্পনারও অতীত।

একাধিক প্রাচীন সেতুর মাধ্যমে দুই তীরের গলাগলি। তারই একটা পার হয়ে আমরা 'ইষ্টরিভার ড্রাইভ' দর্শনের শেষে ফিলাডেলফিয়ার ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে যাচ্ছি। পৌঁছাতে বিশেষ বিলম্ব হল না, বিলম্ব হল গাড়ী রাখার উপযুক্ত স্থান খুঁজে পেতে।

অগণ্য দর্শক আর অসংখ্য গাড়ীর ভিড়। শেষপর্যন্ত ভুগর্ভে একটা গাড়ী রাখার জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল, সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে তার প্রবেশ পথ। প্রথম তলাতে স্থানাভাব, দ্বিতীয় তলাতেও তাই অবশেষে তৃতীয় তলায় গাড়ী রাখার একটা জায়গা পাওয়া গেল। বলার কিছু নেই—Poetic Justice—তৃতীয় শ্রেণীর লোক, তৃতীয় তলায় স্থান। যাহোক যায়গা পেয়েই আমরা কৃতার্থ। পয়সা দিয়ে, কার্ড নিয়ে, লিফটে চড়ে উপরে উঠে আসা হল।

প্রথমেই গেলাম স্বাধীনতা কক্ষ (Indepedence Hall) দেখতে। এখানেই উত্তর আমেরিকার সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে সর্বপ্রথমে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। দর্শকদের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনতে হয়। ৫/৬ টি বিশেষ স্থান দেখবার জন্য সরকারী গাইডের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা নানাস্থানের ইতিহাস বর্ণনা করে দর্শকদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেন। প্রতিবার সীমিত সংখ্যক দর্শনার্থীকে দেখতে দেওয়া হয়। সমবেত দর্শনার্থীদের একটা প্রাথমিক

বক্তৃতা দিয়ে গাইড তাদের সঙ্গে করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যান এবং সে সবের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইতিহাস বুঝিয়ে বলেন।

গাইড আমাদের প্রথমেই নিয়ে গেলেন স্বাধীনতাকক্ষে। একদা বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির চেষ্টায় আমেরিকার অধিবাসীরা বিদ্রোহ করেছিল। জর্জ ওয়াসিংটন ছিলেন সেই মুক্তিবাহিনীর নায়ক। এই সব কক্ষে তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা, সংবিধান রচনা প্রভৃতি কাজগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম—যেন একটা বিরাট বিচারকক্ষ। উঁচু কাঠের পাটাতনের উপর-তিনটি বড় বড় সিংহাসনের মত চেয়ার,টেবিল, দোয়াত, পাখের কলম, মোমবাতি, তাঁদের ব্যবহৃত লাঠি ; নীচে আরও অনেক কাঠের বেঞ্চ, টেবিল, পুরানো পার্চমেন্ট কাগজের দলিলের নকল ইত্যাদি। কল্পনায় কয়েকশ বছর পিছিয়ে গেলাম যেন।

তারপর নিয়ে গেল অনুরূপ আর একটি কক্ষে ; যেখানে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। আগের কক্ষটির মতই এখানেও উপরে একটা বিরাট চেয়ার ও টেবিল, নীচেও অনুরূপ কাষ্ঠিক বেঞ্চ, চেয়ার, মস্যাধার; পাখের কলম, খাতাপত্র, দলিলের নকল ইত্যাদিতে অতীত আজও সরব। দলিলের সঠিক নকল টা (True copy) গাইড দেখাল। তাতে নানা রাজ্যের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর রয়েছে। ইচ্ছা করেই নাকি সব প্রতিনিধিরা স্পষ্ট করে সেদিন নিজেদের নাম সহি করেন নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব অস্পষ্ট করে স্বাক্ষর করেছেন যাতে সহজে তাদের সনাক্ত করা না যায়। কে বলতে পারে—শেষটায় ইংরেজরাও ত জিতে যেতে পারে। এ সব ব্যাপার দেখে জন হেন কক নামক এক জন প্রতিনিধি নাকি নিজের নাম খুব বড় বড় করে লিখলেন—যাতে যে কেউ অনায়াসে তাঁর নাম পড়তে পারে। তাঁর সেই বলিষ্ঠ নীরব প্রতিবাদ আজো লোকের মনে অমর হয়ে আছে আজো বড় করে নাম সহি করতে না বলে লোকে বলে—" Put your John Hen Cock ."।

অতঃপর দেখতে যাওয়া হল "Liberty bell"—অর্থাৎ কিনা সেই সুবৃহৎ কাঁসার ঘণ্টা যেটি বাজিয়ে সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। বেশ বড় এই ঘণ্টাটি। দেখলাম—একপাশে একটু ফাটা। দর্শকবৃন্দ কত না মমতার সঙ্গে তার গায়ে হাত বুলাচ্ছে!

যাক্—ঐতিহাসিক স্থান দর্শনপর্ব ত শেষ করা গেল। এবার পিণ্টু নিয়ে চলল তার প্রাক্তন কর্মস্থল দেখাতে। ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত মিউজিয়াম সেদিন বন্ধ থাকায় সেটা দেখা আর সম্ভব হল না। প্রবোধ দিয়ে পিণ্টু বলল—"যাক্গে—নিউইয়র্ক আর ওয়াসিং-টনের শিল্পসংগ্রহশালা দুটি ত দেখা হবেই। সেগুলি আরও বিরাট, আরও সমৃদ্ধ।" অগত্যা আমরা পিণ্টুর সঙ্গে শহরের নানা উদ্যানে ঘুরে বেড়ালাম বেশ কিছুক্ষণ।

অতঃপর গাড়ীতে পেট্রোল ভরে নিয়ে আমরা একটা রেস্তোরাঁতে বসে চা কফি ইত্যাদি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম। দৌহিত্রটিকেও কিছু আইসক্রিম খাইয়ে কিছুটা হুঁটাহাটি করিয়ে নিলাম। এখান-কার সব সাধারণ ভোজনালয়েই বাথরুমের ব্যবস্থা অত্যুত্তম।

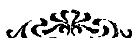
এবার আমাদের পিণ্টুর দুই দিদির বাড়ী যাবার কথা। মাতা ও কন্যা এই সুযোগে একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নাতিটিকেও একটু ঘসামাজা করে গাড়ীতে এসে বসলেন।

কিছুটা শহর পরিক্রমার পর শহরতলির এক মনোরম পরিবেশে সুন্দর একটা ফ্ল্যাটবাড়ীর সামনে আমরা নামলাম। এখানেই পিণ্টুর দীপুদি ও ভগিনীপতি ধ্রুববাবুরা থাকেন। একচোট আদর আপ্যায়ন অন্তে চয়ের পেয়ালা হাতে আড্ডা বেশ জমে উঠল। কথায় কথায় প্রকাশ পেল ধ্রুববাবু ও আমি একই কলেজের ছাত্র ছিলাম যদিও বিভিন্ন সময়ে। কথাপ্রসঙ্গে কত কথাই না এল! —কলেজের প্রায়-বিস্মৃত দিনগুলি, পুরানো বন্ধুবান্ধব থেকে নানা বর্ত্তমান সমস্যা—রাজনীতি থেকে ধর্ম—কিছুই বাকী রইল না।

কন্যা ও মাতার তাগিদে অবশেষে জমাট আড্ডা ছেড়ে গাত্রোত্থান করতেই হল, কারণ পিণ্টুর হেনাদির বাড়ী যেতে সত্যই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।

হেনাদের বাড়ীতে বিলম্বে পৌঁছে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হলাম সবাই। তারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। হেনা আর তার স্বামী ডাঃ ঘোষ,—বাঙ্গালীদের প্রিয় অমলদা এবং তাঁর পুত্র ও কন্যা-সবাই অসাধারণ মেধাবী ;—তেমনি মিশুক আর তেমনি সদানন্দ।

আলাপ আলোচনা এবং অবশেষে ভূরিভোজনান্তে বাড়ী যখন ফিরলাম—তখন অনেক রাত। কাল সকালেই আবার ওয়াসিংটনে যেতে হবে। তাই সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম এবং জর্জ্জ ওয়াসিংটন, এব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তির কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।



[ওয়াসিংটন পর্ব্ব]

চেরী হিলস্, নিউজার্সি

ইচ্ছা ছিল আজ তাড়াতাড়ি রওয়ানা হব, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বাড়ী থেকে বার হতে সেই সাড়ে ন'টা,—'ভদ্রলোকের এক কথা'

পথের একটা দোকানে সামান্য কেনাকাটার প্রয়োজনে একটু দাঁড়িয়ে আমরা আবার 'ডেলওয়ারে' নদীর উপর 'ওয়াল্টহুইটমেন ব্রিজ' পার হলাম। দু'দিকে তরঙ্গায়িত শ্যামল প্রান্তর,—সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য। 'ডেলওয়ারে' নদীর পাশেপাশে কত ছোটবড় অসংখ্য জনপদ কলকারখানা গড়ে উঠেছে।

ছোটবড় নদীনালার কমতি নেই পথের দু'পাশে। 'চেসাপিক' ও 'ডেলওয়ারে' নদীর খালগুলি মাঝে মাঝেই ঝলক দিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর 'এল্করিভার'এর কাছে চলে এলাম,—ছোট্ট ক্ষীণাঙ্গী নদী,—অন্তিম গন্তব্য নিকটস্থ চেসাপিক উপসাগর।

'হার্ভে দ্য গ্রেস'এর কাছে এসে সাস্কুয়েহান্না নদীর পুল পার হলাম। 'পেনসিলভেনিয়া'র পর এর সঙ্গে এটা আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। এবার আমরা 'এবারডিন' 'এজউড' প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল ছাড়িয়ে 'বাল্টিমোরে' এসে পড়লাম। দু'দিকে নয়ন বিমোহন দৃশ্যাবলী।

এ রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে আমরা 'লরেল' শহরে উপনীত হলাম। আমরা ৯৫ নম্বরের রাজপথ ধরে চলছিলাম। কিছুদূর গিয়ে গাড়ী এ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ৪৯৫ নম্বরের রাজবর্ত্ম ধরে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই 'পোটোমেক' নদীর পুল পেরিয়ে আমাদের গাড়ী "জর্জ ওয়াসিংটন পাইকওয়ে' ধরে এগিয়ে চল্ল।

যাক—তাহলে ওয়াসিংটন আর বেশী দূর নয়। সবাই উদগ্রীব হয়ে রইলাম। আমাদের গাড়ী চক্কর খেতে খেতে একসময় খোদ ওয়াসিংটনে প্রবেশ করল। অনেক দূরে আকাশের গায়ে একটা খুব উঁচুস্তম্ভ দেখতে পাচ্ছিলাম। পিন্টু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্ল—"ওটাই হল জর্জ ওয়াসিংটনের স্মৃতিস্তম্ভ। আমরা পরে সেখানে যাচ্ছি।"

আমরা প্রথমে যাচ্ছি "এরলিংটন জাতীয় সমাধি স্থান"এ কেনেডির সমাধি দর্শন করতে। অনতিবিলম্বে পৌঁছে যাওয়া ত হল, তবে সেই একই সমস্যা—গাড়ী রাখার স্থানই সুদুর্লভ। নানা হাঙ্গামা আর হয়রানির ভয়ে যত্রতত্র গাড়ী রাখার উপায় নেই। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষপর্য্যন্ত গাড়ী দাঁড় করাবার একটা জায়গা মিলে গেল। প্রচণ্ড ভিড়,—দুনিয়া উজাড় করে যেন দর্শকেরা এখানে উপস্থিত। অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটা হল। গাড়ী চড়ে সমাধিক্ষেত্রে যাবার জন্য এই টিকিট কেনা। পদব্রজে যেতেও মানা নেই, তবে সময় লাগবে অনেকটা। ২/৩ কামরা বিশিষ্ট গাড়ী, তাতে সারি সারি বেঞ্চ সাজান,—কনডাক্‌টার, ড্রাইভার, মাইক্রোফোন, কোন ব্যবস্থারই কমতি নেই।

গাড়ীতে চড়ার জন্য সাদা, কালো, বাদামী, মোটা, রোগা, বেঁটে, ঢ্যাঙ্গা,—নানাবর্ণের নানা আকার প্রকারের অপেক্ষমান যাত্রীরা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করতে করতে আমরাও এক সময় গাড়ীতে চেপে বসার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

অনতিবিলম্বে গাড়ী সমতলভূমি ছেড়ে পাহাড়ের চড়াই ভাঙ্গতে শুরু করল। সবুজ কার্পেট দিয়ে মোড়া যেন সারা পাহাড়টি। পাকদণ্ডী বেয়ে পাক খেতে খেতে গাড়ী ধীরগতিতে পাহাড়ে উঠছে। দু'ধারে নানা জাতীয় বনস্পতি,—ওক, পাইন, এ্যাস, সিডার, মেপল—আর ও কত কি। সানুদেশ নানা রংএর ঘাসের ফুলে আলো হয়ে রয়েছে। পরিষ্কার ঝকঝকে পরিবেশ, শুকনো পাতা, কাঠখড়,—কোথাও ছড়িয়ে

ছিটিয়ে নেই, তেমনি অনুপস্থিত বাদামের খোসা, কাগজের ঠোঙ্গা ইত্যাদি। রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত বহুকর্মী কর্ম্মরত দেখতে পেলাম।

ঢালু সানুদেশে অসংখ্য সাদা পাথরে যুদ্ধের মৃতসৈন্যদের স্মৃতি-ফলক। পদমর্য্যাদা বুঝি মৃত্যুর পরও থেকে যায়,—তাই পদমর্য্যাদা অনুসারে স্মৃতিফলকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত। কোথাও বা নিকট আত্মীয় স্বজনদের রেখে যাওয়া পুষ্পার্ঘ, পাশে কাগজের তৈরী ছোট একটি জাতীয় পতাকা।

ঘুরে ঘুরে গাড়ী কেনেডির সমাধির নীচে এসে দাঁড়াল। অনেক-গুলি সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠলাম। সমাধিক্ষেত্রে এসে দেখলাম প্রস্তরফলকে কেনেডি ও জুনিয়র কেনেডির নাম লেখা। একটা জায়গায় অনির্বান অগ্নি জ্বলছে। বহুযাত্রী এখানে এসে নত মস্তকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে প্রয়াত মহাপ্রাণের প্রতি নীরবে সম্মান প্রদর্শন করছেন।

পিণ্টু বল্ল—'একটু তাড়াতাড়ি চলুন, এক্ষুণি প্রহরী বদল হবে, ওটাও দেখার মত।' এখানে ২৪ ঘণ্টাই প্রহরী রয়েছে। শিক্ষানবীশ সৈন্যরাই সাধারণতঃ এই কাজ করে থাকেন। প্রতি ২ ঘণ্টা বাদে বিউগিল বাদ্যের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্ত্তব্যের হস্তান্তর হয়ে থাকে। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে—এটাও দেখা হয়ে গেল। তারপর দেখা হল প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ছোটভাইএর সমাধি। পাহাড় কেটে শ্বেত পাথরের দেয়ালে তাঁর বক্তৃতা থেকে নানা সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি রয়েছে। পড়ে শ্রদ্ধা জাগে। জানি না কি একটা রহস্যময় নিয়মে গাছ, পাথর, কচ্ছপ, শকুন,—এরা হয় অতি দীর্ঘায়ু, আর মহামানবেরা সাধারণতঃ হন স্বল্পায়ু।

গাড়ী পাহাড়ের গায়ে যুদ্ধে মৃতসৈনিকদের স্মৃতিফলকের পাশ দিয়ে আর একটা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল, তার মাথায় একটা সাদা বাড়ী।

পিণ্টু বল্ল—"এটা হচ্ছে রবার্ট লি-র বাসস্থান।" কে এই রবার্ট লি?

ক্রীতদাস প্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে আমেরিকায় এব্রাহাম লিঙ্কনের আমলে যে রক্তক্ষয়ী অন্তর্যুদ্ধ হয়েছিল—তাতে বিরুদ্ধবাদী দক্ষিণ অঞ্চলের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এই রবার্ট লি। বিপক্ষীয় দলের সেনানায়কের বাসস্থান হলেও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নের মর্য্যাদা দিয়ে এই অট্টালিকাটির যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

সমাধি দর্শনান্তে গাড়ী চড়ে নীচে নেমে আসা হল। এবার যাব এব্রাহাম লিঙ্কনের সমাধি দেখতে। বেশ চড়ারৌদ্র, তাপাঙ্ক ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কম নয়। ঘামতে ঘামতে পদব্রজে অনেকটা পথ গিয়ে তবে গাড়ীতে চড়ে বসলাম।

অনতিবিলম্বেই আমরা লিঙ্কনের সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। একটা বেশ উঁচুবেদীতে লিঙ্কনের চিন্তাশীল মূর্ত্তি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

মাথার উপর উঁচুছাদ,—অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়,—না হলে তাঁর নাগাল পাবই বা কি করে!

সামনে সবুজ ঘাসেঢাকা বিরাট ময়দান। দুধারে সযত্নবর্দ্ধিত নানা জাতের অতি সুন্দর সুন্দর পাইনের সমারোহ, মাঝখানে একটি লম্বা জলপূর্ণ বাঁধান খাল,—তাতে অসংখ্য ফোয়ারা ঠিক যেমনটি আমাদের তাজমহলে রয়েছে। তার এক পাশে ওয়াসিংটনের স্মৃতিস্তম্ভ।

এই জলধারায় তার ছায়া পড়ে এই দেশের দুই মহামানবের সমাধি দুটির মধ্যে যেন এক আত্মিক যোগাযোগ এনে দিয়েছে। একজন এনেছিলেন বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দেশের স্বাধীনতা আর অন্যজন বাঁচিয়েছিলেন দেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত থেকে। ক্রীতদাসপ্রথা নিবারণ করে তিনি ত সারাবিশ্বের নমস্য হয়ে রয়েছেন—"যাবৎ চন্দ্র দিবাকরৌ।" এব্রাহাম লিঙ্কন ত ক্রীতদাসপ্রথা নিবারণ করে আইন পাশ করলেন। কিন্তু উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের নায়করা এর বিরোধিতা করে বিদ্রোহ করলেন এবং তার ফলে দেশে অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হল। সুদীর্ঘ রক্তস্রাবী সংগ্রামে লিঙ্কন বিজয়ী হয়ে ক্রীতদাসপ্রথা নিবারণ করলেন। তাতে কেবল ক্রীতদাসপ্রথার

নিবারণই নয়,—আর একটি মহৎকার্য্য সাধিত হল, দক্ষিণাঞ্চলের নায়কদের ক্ষুদ্রস্বার্থের বশীভূত হয়ে দেশকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা সমূলে বিনষ্ট হল।

এবার পিন্টু আমাদের ভিয়েৎনাম স্মৃতিচিহ্ন (Vietnam Memorial) দেখাতে নিয়ে চল্ল। বড় আশ্চর্য্য সৃষ্টি এটা। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ নিয়ে এদেশে মতান্তর কম ছিল না। ভেটারেন্স অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত ভিয়েৎনামে মৃত সৈন্যদের প্রাপ্য মর্য্যাদা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

ঠিক হল লিঙ্কনের সৌধের পাশেই হবে তার স্থান। এ দেশে সরকার নাকি এসব কিছু করেন না। জনসাধারণের চাঁদায় এটা তৈরী করা হয়েছে। এক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এর নক্সা নির্বাচন করা হয়েছিল, প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়েছিলেন স্থাপত্যবিভাগের এক চৈনিক ছাত্রী।

কোনও অভ্রংলিহসৌধ এটা নয়। এর উচ্চতম বিন্দুই হল ভূমির সমান্তরাল। বিরাট সবুজ প্রান্তরের একটা বিন্দু থেকে একটা কাল পাথরের দেয়াল সামনের দিকে ৭০/৮০ ফিট সিধে মাটির তলায় নেমে গিয়ে সমকোণে বেঁকে আবার ধীরে ধীরে প্রায় ২০/২৫ ফিট উপরে উঠে জমির সঙ্গে মিশে গেছে। এই বিরাট কালপাথরের দেয়ালে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের প্রত্যেক্যের নামধাম লেখা রয়েছে।

প্রবেশ মুখে ছোট চেয়ার টেবিল, টেলিফোন, মৃত সৈন্যদের কার নাম কোথায় লেখা আছে, তার একটা 'নির্দ্দেশক গ্রন্থ' বা 'ডাইরেক্টারী' যাতে আত্মীয় স্বজনেরা নিজেদের লোকের নাম ঠিক কোথায় রয়েছে তা সহজে খুঁজে পেতে পারেন।

এক বৃদ্ধকে দেখলাম কম্পিতহস্তে সেই ডাইরেক্টারীর পাতা উল্টাচ্ছেন। স্থানে স্থানে কাগজের টবে ফুলের তোড়া, কোথাও বা মৃতব্যক্তির উদ্দেশে লেখা চিঠি পড়ে রয়েছে—ফুলের তোড়ার পাশে।

কেউবা নতজানু হয়ে সাশ্রুনেত্রে প্রার্থনারত। দেখে অভিভূত হবার মত দৃশ্যই বটে।

এই অভিনব পরিকল্পনার একটা মানেও যেন খুঁজে পেলাম। এ যুদ্ধ ত আর এ দেশের পক্ষে গৌরবের কিছু নয়। তাই এই স্মারক-চিহ্নও উচ্চশির নয়। আর এ যুদ্ধের নৈতিকতা নিয়েও অবচেতন মনে একটা অসাচ্ছন্দ্য এ দেশের অনেকেরই ছিল। উচ্চশির উদ্ধত্যের পরিবর্তে এর স্থান হয়েছে ভূগর্ভে, সবুজ প্রান্তরের নিরাবরণ নিরাভরণ পরিবেশে'। শুধু অন্তর্মুখী মন নিয়ে এখানে এলেই এর অশ্রুসিক্ত নীরব ভাষার মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব।

দেখা শেষ হলে নীরবে আমরা গাড়ীতে ফিরে এলাম। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই দীর্ঘ সফর,—

—"নাই নাই নাই যে সময়।"

এবার আমাদের দ্রষ্টব্য ওয়াসিংটনের শিল্পসামগ্রীর জাতীয় প্রদর্শন কক্ষ (National gallary of Art)। ওখানে পৌঁছে আবার সেই পুরাণো সমস্যার সম্মুখীন হলাম,—গাড়ী রাখার স্থানাভাব।

চক্কর কেটে কেটে স্থান না পেয়ে পিণ্টু অগত্যা গাড়ীটাকে অনেক দূরে গিয়ে দাঁড় করাল। কড়ারৌদ্রে বাচ্চা নিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে আর্ট গ্যালারীতে পৌঁছালাম। বিনি পয়সায় এখানে কিছু হবার জো নেই। শুনেছি মৃত্যুর কবর দেবার জায়গাও নাকি আগেভাগে কিনে রাখতে হয়, সত্যি মিথ্যে হলফ্ করে বলতে পারব না।

টিকিট কেটে ছেলেবুড়ো সবাই ত প্রবেশ করলাম। ঢুকে কিন্তু দেহমন জুড়িয়ে গেল। কী সুন্দর ব্যবস্থা! উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে টবে টবে নানা জাতীয় ফুলের সমারোহ, বসে বিশ্রাম করবার, পোষাক ঠিকঠাক করবার চেকরুম, ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পৃথক অতি পরিস্কার বাথরুম, কোথায় কি দেখব এসব সংবাদ সংগ্রহার্থে 'ইন্‌ফরমেশান সেণ্টার', সাধারণের ব্যবহারের জন্য টেলিফোন, প্রাথমিক চিকিৎসাগার,

উপর নীচ করার সুবিধার জন্য 'এলিভেটর' 'প্রতিবন্ধী' অর্থাৎ বিকলাঙ্গেন্দ্রিয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা—সব কিছুই এখানে রয়েছে।

প্রতি কামরায় পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা রয়েছেন দর্শনার্থে রক্ষিত জিনিষপত্রের রক্ষণাবেক্ষণে ও দর্শনার্থীদের সর্বপ্রকার সাহায্যদানে সদাপ্রস্তুত হয়ে।

এই বাড়ীটাও কিন্তু দেখবার মত। এর স্থপতি হলেন বিখ্যাত স্থপতি জন রাসেল পোপ। ওয়াসিংটনের বহু বিরাট বিরাট সৌধ এঁরই পরিকল্পনায় তৈরী। এসব জায়গা পিণ্টুর বহুবার দেখা,—তাই আমরা সবাই তার পেছনে পেছনে ছবি ও ভাস্কর্য্যসমৃদ্ধ মেনফ্লোরে ঘুরছি।

প্রথমেই চোখে পড়ল ভাস্কর্য্যের আদিপর্বের কাজ,—পারস্য ও গ্রীসের ভাস্কর্য্যশৈলীর সংমিশ্রণ বলে মনে হল। তার পর দেখলাম—ধীরে ধীরে গ্রীকভাস্কর্য্য তার স্বকীয়তায় কি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—তার বেশ কিছু নমুনা। পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত গ্রীকভাস্কর্য্যের নমুনাও অনেক রয়েছে,—তবে ভাঙ্গাচোরাই বেশী। এদের ছবি আগে অনেক দেখেছি; এখন চাক্ষুষ পরিচয়ে পরম প্রীত হলাম।

এবার অভিসার চিত্ররাজ্যে। বাইজেনটাইন স্কুলের কাজ 'মেডোনা ও শিশু' দেখলাম। প্রাচ্যসুলভ বহুল-অলঙ্করণের সঙ্গে আলোছায়ার প্রয়োগে ছবিকে ত্রিমাত্রিক করার প্রচেষ্টা এর বৈশিষ্ট্য।

নানা ছবি দেখতে দেখতে চোখে পড়ছিল একটা ক্রমিক বিবর্তন—ধীরে ধীরে রং-এ রেখায়, আলোছায়ার খেলায়, কেমন করে নিখুঁত প্রকৃতির অনুকৃতি এসে যাচ্ছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে আঁকা 'গিয়ব গিয়ন' এর 'এডোরেশান অফ দি শেফার্ডস 'এবং টাইটানের 'ভেনাস' দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিল্পসৃষ্টি 'পেনিনি'-র 'ইন্‌টিরিয়ার অফ দি পেনথিয়ন' দেখা হল।

মধ্যযুগের গির্জ্জার ছত্রছায়ায় এর আরম্ভ হলেও রেনেসাঁর যুগে এই

চিত্র এসে দাঁড়িয়েছিল মাটির বুকে। তখন ধর্ম আর তার অনুপ্রেরণা নয়; অনুপ্রেরণা প্রকৃতি, বিজ্ঞান আর মানবিকতা। 'কেরেচ্ছি'র আঁকা 'আলেক্সজেনড্রিয়ার' 'সেন্ট ক্যাথারিনের স্বপ্নের' উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তবে এত দ্রুত চোখ বুলিয়ে ছবি দেখার সাধ সত্যই মিটে না।

একটা ছবি দেখে চমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কার আঁকা ছবি এটা! তাই ত! এ যে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির আঁকা 'গিনেভ্রা দা বেনসি'। এঁদের আঁকা ছবির মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখে ছেলেবেলায় কতদিন মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। ভাবিনি আসল ছবিগুলি দেখা কখনো সম্ভব হবে। আজ আসল ছবি দেখে ধন্য হলাম। হায়! দেখার জিনিষ এত রয়েছে অথচ সময় এত কম আর একটি দর্শনীয় ছবি চোখে পড়েছিল 'রুবেন্স'-এর আঁকা 'সিংহের গুহায় ডেনিয়েল'। এটা সপ্তদশ গোড়ার দিকের সৃষ্টি। গুহার মুখ দিয়ে আলো এসে পড়েছে ডেনিয়েলের প্রার্থনারত নিতান্ত অসহায় মুখের উপরে; ভুক্তপঞ্জর হাড়-ছড়ান প্রাঙ্গনে গোটা আটেক সিংহ। তাদের মধ্যে বিকশিতদন্ত ২/৩টি ছাড়া আর সবাই শান্ত হয়ে এসেছে;—কেন তারা নিজেরাই কি জানে।

'ভেনডাইক'এর আঁকা 'হেনরিয়েটা আর তার বামন' ছবিটা দেখলাম। এখানে রেমব্রেন্টএর আঁকা একাধিক প্রতিকৃতি দেখলাম;—তার মধ্যে তাঁর নিজের প্রতিকৃতিও রয়েছে। ডেভিড-এর আঁকা নেপোলিয়ানের একটি দাঁড়ান ছবি দেখলাম,—প্রকাণ্ড ছবি,-তাতে ব্যক্তিত্ব অতি চমৎকারভাবে ফুটে বা'র হচ্ছে।

আর দেখলাম দু'জন ইংরেজের কীর্ত্তি,—কনষ্টেবল আর টার্নার এর। না—না, কনষ্টেবল মোটেই পুলিশ নন এবং টার্নারও কোন ক্রমেই কুন্তকার নন। এরা বিখ্যাত শিল্পী।

এই দুইজন ইংরেজ শিল্পীর আঁকা বিরাট বিরাট নৈসর্গিক দৃশ্য দেয়াল জুড়ে টাঙ্গান। একজন ইংলণ্ডের গ্রাম্য পরিবেশ অঙ্কনে অত্যন্ত

পারদর্শী ; আর এক জনের বিশেষক্ষেত্র হল—প্রকৃতির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য; জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ ও দৃশ্যপট, আলোছায়া মেঘ ও কুয়াশা দিয়ে গড়া এক রহস্যময় সৌন্দর্য্যের মায়াজাল সৃষ্টি। অতি চমৎকার!

আফশোষ হচ্ছে প্রতি পদেপদে,—এত তাড়াহুড়ো করে কি ছবি দেখা হয়! যথেষ্ট সময় নিয়ে দেখতে হবে; তবে ত এক একটা করে পর্দ্দা সরে গিয়ে ছবির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হবে।

জাপানীরা নাকি এই ভাবেই ছবি দেখে। তাদের ঘরের দেয়ালে নাকি একটাই ছবি টাঙ্গান থাকে। বহুদিন ধরে দেখার পর ছবিটা যখন নিঃশেষে দেখা হয়ে যায়, তখনই শুধু দেয়ালে আর একটা ছবি পালটে বসান হয়। এই সম্পর্কে ক্ষিতিবাবুর মুখে শোনা একটা গল্প শুনাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ নাকি একদা জাপানভ্রমণের সময় এক চাষীর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘরের মস্তবড় দেয়ালে একখানা মাত্র ছবি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"এত বড় দেয়ালে একটী মাত্র ছবি কেন?" গৃহস্বামী আধোআধো ভাষায় যে উত্তর দিলেন তা অনেকটা এই রকম—"আমরা ছবিটা দেখি-দেখি-কেবল দেখি,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ছবিটা খেয়ে ফেলে অবশেষে সেই ছবিটাই হয়ে যাই।" এর থেকেই বুঝতে পারবে কি গভীরভাবে সে দেশের সাধারণ লোকেরাও ছবি দেখে থাকে।

এখানে একাধিক জায়গায় একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। নানা বয়সের শিল্পীরা—বিশেষ করে মহিলা শিল্পীরা প্রাচীনযুগের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রের সামনে বসে প্রতিলিপি অঙ্কনে ব্যস্ত। সঙ্গে জিনিস-পত্র সামান্যই,—একটা মোটামুটি শক্তকাগজকে প্যালিট (Pallete) বানিয়ে তার উপর প্রয়োজনীয় রং স্বল্পমাত্রায় নিয়ে গুটিকয় নানা আকারের তুলি নিয়ে ছবি এঁকে চলেছেন।

এই অত্যাধুনিক সু-রিয়েলিজম্ এর (Surrealisn) যুগে এরা এখনো প্রাচীন শিল্পাদের চিরন্তন মূল্যের শিল্পকর্ম্মের অনুকরণ করেছেন —তাঁদের রং ও তুলি ব্যবহারের বিশেষ ঢং আয়ত্ত করার জন্য ;—দেখে খুব ভাল লাগল।

তারপর চীন, জাপান ও মিশরের কারুশিল্প ও ছবির উপর চোখ বুলিয়ে যখন বাইরে এলাম—তখন মনের মধ্যে যতটা আনন্দ ও বিস্ময়, ঠিক ততটাই বিষাদ আর আফশোষ,—এত শীঘ্র এই বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীতে চড়ে বসলাম। এবার আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। লরেল, এস্কবিজ, বাল্টিমোর—পার হয়ে হার্ভে দ্যা গ্রেসের কাছে এসে সাস্কুয়েহান্না নদীর পুল পার হয়ে এগিয়ে চল্লাম;—দু'দিকে ঢালুগড়ান জমি আর পাইন সিডারের বন; আর থেকে থেকেই কলকারখানা।

এসব পেছনে ফেলে ডেলওয়ারে নদীর পুল পার হয়ে এক সময় নিউজার্সির চেরীহিলস্‌এ ফিরে এলাম;—পশ্চিম গগনে অস্তগামী সূর্য্য তখন পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের সঙ্গে হোলিখেলায় প্রমত্ত। পশ্চিম গগন প্রান্তে অবর্ননীয় সৌন্দর্য্য;—কিন্তু ক'জনই বা চোখ মেলে দেখি বিশ্বস্রষ্টার এই অনবদ্য শিল্পকর্ম্ম—যা এই খামখেয়ালী চিরঅতৃপ্ত শিল্পী দিনের পর দিন এঁকে যাচ্ছেন আর পরক্ষণেই মুছে ফেলছেন পরম অবহেলায়!

বাড়ী ফিরে এসে কিছুটা বিশ্রাম করা হল। তারপর স্নান, পান ও ভোজনান্তে মিণ্টুদের সঙ্গে "আখেরী" আলাপ আলোচনা হল কিয়ৎকাল;-কারণ কাল প্রত্যুষেই নিউইয়র্ক যাত্রা করা হবে,—আর চেরীহিলস্‌এ ফিরে আসা হবে না। নিউইয়র্ক দেখে সেখান থেকে নিউহেম্পসায়ারে যাব—পাথরের পায়ে মাথা-কুটে-মরা ফেনিল আটলান্টিক সমুদ্র সন্দর্শনে।

কিছুটা গোছগাছ করা জরুরী,—আরও বেশী জরুরী পর্য্যাপ্ত বিশ্রাম—বিশেষ করে পিণ্টু, মিতা ও দৌহিত্রটির। সুতরাং তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া গেল। বিছানায় শুয়ে ছবির রাজ্যে বিহার করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—জানি না।



[নিউইয়র্ক পর্ব]

হেম্পটন বিচ, নিউহেম্পসায়ার, বারহারবার

নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল—'চরৈবেতি'—আজ সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে—'নিউইয়র্ক দর্শনায়'। সুতরাং বৃথা বিলম্ব না করে যাত্রার আয়োজন শুরু হল। মিণ্টুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়লাম—যথাসময়ে অর্থাৎ সেই সাড়ে নটায় :— 'ভদ্রলোকের এক কথা'—আগেই ত বলেছি।

আজ নিউইয়র্কে আমাদের মুখ্য দ্রষ্টব্য 'মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম আফ আর্ট'। ঘুরে ফিরে বাকী যা দেখা হবে—সেটা হবে ফাও। সময় ত আমাদের হাতে বেশী নেই।

এবারও আমরা নিউজার্সি থেকে রওয়ানা হয়ে ডেলওয়ারে নদী পার হলাম। 'নিউজার্সি টার্ণ পাইক' ধরে চলেছি; দু'ধারে ঢেউ খেলান মাঠ, নানা জাতীয় পাইন আর দেশজ বৃক্ষ, লোকালয় আর কল কারখানা। হাই টাউন, জেমস্‌বার্গ, নিউবার্ণস উইক, প্রভৃতি জনপদ পেছনে ফেলে যতই এগুচ্ছি— ততই কলকারখানা আর চিমনীর সংখ্যা বাড়ছে; দিগন্ত ধূম্রধূসর। রাস্তাই বা কত আর উড়ালপুলই বা কত! 'নে-য়ার্ক' অতিক্রম করে চল্লাম। অসংখ্য কলকারখানার চিমনী উদ্গারিত কালো ধোঁয়ায় নীলাকাশের নীলিমা কলঙ্কিত। যতই নিউইয়র্ক কাছে আসছে প্রকৃতির উপর মানুষের অত্যাচার ততই বাড়ছে। 'জার্সি সিটি' অতিক্রম করে 'হেকেনসেক' নদী পার হয়ে গাড়ী এবার লিঙ্কন সুড়ঙ্গে ঢুকবে। আমরা এখন হাডসন নদীর নীচ দিয়ে যাব। নদীর নীচ দিয়ে যাব—ভাবতেই রোমাঞ্চ—নয় কি? কাজে কিন্তু কিছুই টের পাওয়া গেল না। রাস্তাটা সামান্য ঢালু হতে হতে একটা উজ্জ্বল

আলোকিত সুড়ঙ্গে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর রাস্তাটা সমতল হল এবং তার কিছুক্ষণ পরেই রাস্তা একটু উঁচু হতে থাকল এবং অচিরেই সুড়ঙ্গ থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটল এবং ঢুকলাম নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ 'ম্যানহাট্টান' এলাকায়।

কড়া নিয়ম,—সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যাবার সময় সব গাড়ীকেই ঠিক ৪০ মাইল (ঘণ্টায়) বেগে যেতে হবে। ম্যানহাট্টানে আগে রাস্তায় পদচারী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ম্যানহাট্টানে এসে দেখলাম রাস্তায় man হাঁটেন বটে।

এখানকার রাস্তার নানা অলিগলি ঘুরিয়ে দেখিয়ে পিণ্টু বল্ল, এখানে খুব সস্তায় খাবার পাওয়া যায়। এখানে নানা দেশের নানা লোকের বাস,—তাই নানা দেশের খাবারও এখানে মেলে।

বড়বড় আকাশচুম্বী প্রাসাদ,—তার পাশেপাশে পুরানো কাঠের বাড়ী—বারান্দায় খাবারের দোকান,—এ দৃশ্য মাঝেমাঝেই চোখে পড়ছে। কোলকাতার কোনো কোনো অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলটা খুব আলাদা নয়।

পিণ্টু এবার আমাদের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার'-এর কাছে নিয়ে এল। এখানে অনেক উঁচু বহুতলবিশিষ্ট বাড়ীর ভিড়। সেই ইষ্টক অরণ্যের মধ্যে পাশাপাশি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছু'টি খুব উচ্চ বহুতলবিশিষ্ট সৌধ,—পশুর মিছিলের মধ্যে উচ্চগ্রীবাগর্ব্বী ছুটি জিরাফের মত। বর্তমানে পৃথিবীর ছু'টি উচ্চতম সৌধ বলে এদের গর্ব। তবে যার গর্ব হরণ করে এরা উচ্চতম সৌধের খ্যাতি লাভ করেছেন—সেই ভ্রষ্টগরিমা 'এম্পায়ার বিল্ডিং'-এর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এদের তুলনাই হতে পারে না। এ যেন হঠাৎ-বিত্তবানের অতিপ্রকট ঐশ্বর্য্যের ঔদ্ধত্য, আর ওটা যেন ঐতিহ্যবান পড়ন্ত ভূস্বামী পরিবারের প্রাচীন সংস্কৃতি।

অনেক চক্কর কেটে আমাদের গাড়ী এবার সমুদ্রের একটা খাঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল : এখান থেকে বিখ্যাত 'ষ্টেচু অফ সিবার্টি' দেখতে সুবিধা হবে এই আশায়। ধুয়াশা ত ছিল আরও ছিল সমুদ্র

গর্ভ থেকে হঠাৎ গলাবাড়িয়ে থাকা একটা বিরাট সৌধ—যা এই বিশিষ্ট মূর্ত্তিটিকে এই জায়গা থেকে দেখার পক্ষে বিরাট বাধা। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে স্বাধীনতার প্রতীক 'ষ্টেচু অব লিবার্টি' আমাদের নয়নগোচর হল।

একটু চা পানের পর চাঙ্গা হয়ে পিণ্টু আবার গাড়ী চালাতে আরম্ভ করল। ঘুরে ঘুরে আমরা U. N. O. ভবনের সামনে এলাম। নানা দেশের নানা বর্ণের পতাকা বাতাসে উড়ছে, তাদের মধ্যে আমাদের জাতীয় পতাকা দেখতে পেয়ে সবাই উৎফুল্ল। ইচ্ছা ত ছিল, তবুও ভিতরে প্রবেশ করে যে একটু বিশদভাবে দেখব—তার উপায় নেই,—সময় কোথায়! তাই বাইরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে দুধের শখ ঘোলে মেটান হল।

এবার আমরা সেণ্ট্রাল পার্ক দেখতে চল্লাম। 'হোয়াইট হাউস' ভবনটিও দূর থেকেই দেখছি; তবে জানলাম—পার্কের ভিতর দিয়ে এবং পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দেখা নেহাৎ কম হবে না। তা মন্দ কি—'ঘ্রাণেন অৰ্দ্ধ ভোজনং।'

যেতে যেতে কিছুক্ষণ পর মনে হল—যেন মধ্যযুগের একটা পাহাড়ী জায়গার কোনো এক প্রাচীন সেতুর নীচ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। পিণ্ট বল্ল—'এইবার আমরা পার্কের এলাকায় এসে পড়লাম।"

আকাশচুম্বী অট্টালিকাকণ্টকিত বিংশশতাব্দীর এই অত্যাধুনিক শহর নিউইয়র্কের বুকে সবুজ গাছপালা, ঘাস, জঙ্গল, পাথরের বিরাট বিরাট চাঁইসম্বলিত আস্ত একখানা জঙ্গলভর্তি পাহাড় এল কোথা থেকে? এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না,—যেন সযত্নে রক্ষিত এক টুকরা আদিম পাহাড়ী বনাঞ্চল।

এই শহর হল পৃথিবীর বৃহত্তম শহরগুলির অন্যতম;—জমির মূল্য এখানে কল্পনাতীত। তার মাঝখানে ৮৪০ একর জমিতে আদিম বন-জঙ্গলের পরিবেশকে নষ্ট না করে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য এরা এক বিরাট উদ্যান গড়ে রেখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে খুব যত্ন করে

লাগান নানা ধরণের গাছপালা, বাগান; হ্রদ, স্নানাগার, সাঁতার কাটার জন্য কৃত্রিম সরোবর, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নাগরদোলা (নাগরদের জন্য কিন্তু নয়), বিখ্যাত 'ক্লিয়োপেট্রাস নিডল্'—যেটা এঁরা ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে মিশর থেকে উপঢৌকন হিসাবে পেয়েছিলেন। তাছাড়া এখানে রয়েছে চিড়িয়াখানা, বিনিপয়সায় সেক্সপীয়রের নাট্যাভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ, আর রয়েছে ছোটদের জন্য ছোট্ট ছোট্ট পশুপক্ষীসম্বলিত এক বিশেষ চিড়িয়াখানা যেখানে জন্তুজানোয়ারের গায়ে বাচ্চারা আশ মিটিয়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারে,—কেউ মানা করে না। কী নেই এই আজব উদ্যানে? নির্জ্জনে বসে চিত্রাঙ্কন বা কাব্যরচনার জন্য এখানকার বুদ্ধিজীবীদের ভিড় নাকি এখানে লেগেই থাকে।

একদা যে দ্বীপময় শহরকে সামান্য ২৪ ডলারের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল আজ সেই শহর হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যবসায় কেন্দ্র। কী বিচিত্র এই নিউইয়র্ক শহর! কী বিচিত্র এই রাজ্য! কত বিচিত্রই বা এর ভূপ্রকৃতি। ইরি আর অণ্টারিও হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় অঢেল উর্বরজমি যেমন রয়েছে—তেমনি এখানে আছে প্রচুর পাহাড় পর্বত আর বন্ধ্যাবন্ধুর প্রস্তরসঙ্কুল মালভূমি।

এখানে যেমন রয়েছে নদী, পর্বত, বনজঙ্গল, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতির বৈচিত্র্য—তেমনি রয়েছে দেশদেশান্তরাগত কতই না বিচিত্র মানবগোষ্ঠি! এখানকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোকই নাকি হয় পুরোপুরি ভিন্‌দেশী, নয় ধমনীতে বইছে ভিনদেশীয় রক্তধারা। যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গে যেতে চাও—তবে বলব ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ যত হয়েছে কম করেও তার এক তৃতীয়াংশই হয়েছে এই রাজ্যের মাটিতে।

যাকগে—নিউইয়র্কপ্রশস্তি বা তার ইতিহাস আলোচনা কোনো-টারই সময় আমাদের নেই। বিখ্যাত মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে কি কি দেখলাম—সেই প্রসঙ্গে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। তা না হয় হল, কিন্তু দু'বছরের দৌহিত্রটির দিকটাও ত দেখতে হবে। এ সব ব্যাপারে তার

কতটকুই বা আনন্দ। বরং ঠিকসময়ে ভাল একটা জায়গা দেখে তাকে খাইয়ে দাইয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা তার পক্ষে ঢের বেশী জরুরী। সুতরাং একটা ভাল জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে বাচ্চাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, খাইয়ে, দাইয়ে আমরা নিজেরাও কিছু খেয়ে নিলাম। গাড়ীটাকেও বঞ্চিত করা হয় নি। তার খাদ্য পেট্রোল তাকে পেট ভরেই খাওয়ান হল।

আমাদের বাসনা—অতঃপর মিউজিয়াম দর্শন এবং তৎপর তৎপরতার সঙ্গে নিউহেম্পসায়ারের দিকে নবঅভিসার।

মিউজিয়ামে ত পৌছান গেল, কিন্তু গাড়ী রাখার চিরন্তন সমস্যা যে পুনঃপৌনিক দশমিকের মত পেছনে লেগেই আছে। অগত্যা পিন্টু মিউজিয়ামের পাশে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বল্ল—'আপনারা ভেতরে গিয়ে দেখতে শুরু করুন, ততক্ষণে আমি গাড়ীর একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে মিউজিয়ামেই আপনাদের খুঁজে বার করব।

অতঃপর মিতাই কাণ্ডারী হয়ে বালবৃদ্ধাসহ মিউজিয়ামে গিয়ে ঢুকল। ইনফরমেশান সেন্টার থেকে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আমরা প্রথমে গেলাম গ্রীকভাস্কর্য্যের নমুনা দেখতে।

এটা নাকি পশ্চিম গোলার্দ্ধের বৃহত্তম সংগ্রহশালা। এখানে তেত্রিশলক্ষেরও বেশী দর্শনীয় সামগ্রী আছে। এটা কত বিশাল জান?

১৪ লক্ষ বর্গফুট এর আয়তন। প্রাচীন পারস্য গ্রীস ও মিশর-এর যুগ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পসম্ভার সমৃদ্ধ এই মিউজিয়ামে কী আছে আর কী নেই!

গ্রীকভাস্কর্য্যের নমুনা এখানে যা দেখছি তা ওয়াসিংটনে দেখা শিল্পসামগ্রীর অনুরূপ! সুতরাং এখানে খুব বেশী সময় না দিয়ে আমরা অতঃপর ইয়োরোপের মধ্যযুগের ছবি দেখতে গেলাম। প্রাথমিক যুগের ধর্মানুপ্রেরিত ছবি থেকে অত্যাধুনিক—কত ছবিই না রয়েছে এখানকার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে! এখানে র‍্যাফেলের আঁকা ছবি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলাম। রেমব্রেন্টের আঁকা নানা প্রতিকৃতি এখানে দেখতে

পেলাম। অপূর্ব,—যদিও চিত্রিতদের মধ্যে কাউকে চিনি না তবু ও যেন মনে হয় চিত্রে যথাযথ চরিত্র ফুটে উঠেছে। আর বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে দেখলাম উনবিংশ শতাব্দীর আঁকা চিত্রসম্ভার। দেয়াল জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল অপূর্ব ছবি সব :—নিসর্গ, প্রতিকৃতি আরও কত কি! এসব ছেড়ে চলে যেতে কি মন চায়! পবন-হিল্লোলিত চীনাংশুকের পতাকাগ্রের মত মন সর্বদা পেছনে পড়ে থাকতে চাইছে। তবুও যেতেই হয়।

স্বল্পসময়ের মধ্যেই সব না হোক—বিশিষ্ট দর্শনীয় সব কটাই দেখতে হবে।

এখানকার মিশরীয় সংগ্রহ অবশ্যদ্রষ্টব্য। এই সংগ্রহশালার দ্রষ্টব্যও অঢেল। আরব, পারস্য, আফ্রিকা, চীন, জাপান, ভারত—সব দেশের সব কালের শিল্পসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে এঁদের আগ্রহ অসীম।

এবার চীনা ও জাপানী ছবি দেখতে যাওয়া হল। ওয়াসিংটনে এ বিভাগটি সময়াভাবে ভালভাবে দেখা হয় নি :—চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলাম কোনোমতে।

দেখা যাক্—এখানে কতটা দেখা হয়।

চীনের প্রাচীন চীনামাটির পাত্রের গায়ে সূক্ষ্ম অলঙ্করণগুলি দেখে আমরা ত মুগ্ধ। কী চমৎকার সূক্ষ্মকাজ আর সৌন্দর্য্যবোধ! ফুল, লতা, পাতা, ফড়িং তাই নিয়ে কত নক্সা, কত অলঙ্করণ! আর জলের রং ও তুলির ব্যবহারে চীনাদের ত জুড়িই নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দেখার মত তুলির কাজ ও মুনশীয়ানা।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা বাদ্যযন্ত্রের মহলে এসে উপস্থিত হলাম। প্রাচ্য, প্রতীচ্য,—কত দেশের, কতযুগের বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ এখানে! এক জায়গায় দেখলাম—আফ্রিকায় তৈরী মরার মাথার খুলির উপরে চামড়া চড়িয়ে পশুর অন্ত্রের তন্তুতে তৈরী কত বিচিত্র—প্রায় প্রাগৈতিহাসিক পর্য্যায়ের বাদ্যযন্ত্র সব! ছড় তৈরী হয়েছে পশুর দীর্ঘপুচ্ছ দিয়ে, কচ্চিৎ মেয়েদের মাথার কৃষ্ণকেশদাম দিয়ে। অবাক্ লাগছিল।

এদের সামান্য হেরফের করেই ত বেহালা, এস্রাজ, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্রের উৎপত্তি।

আবার তালের যন্ত্রই বা কত রকমের! কোনোটা বা ধাতব, কোনোটা কাঠের উপর চামড়া চড়িয়ে, কোনোটা ত স্রেফ বিশুদ্ধ কাষ্ঠনির্মিত ;—সরব করতে হলে সবগুলিকেই আঘাত করতে হবে,—তা মৃদু অঙ্গুলিস্পর্শেই হোক বা চাপড় মেরেই হোক অথবা ডাণ্ডা মেরেই হোক।

পারস্য আরব ও অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের তারের বাদ্যযন্ত্র দেখে মনে হল—আমাদের সরোদ, সেতার, দিলরুবা, সুরবাহার প্রভৃতির পূর্ব পুরুষদের দেখছি। একটা জায়গায় নানা ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সযত্নে রক্ষিত দেখে সবাই পুলকিত শিহরিত হলাম। এখানে নেই কী! সারেঙ্গী, সরোদ, সেতার, রুদ্রবীণ, দক্ষিণী বীণা, দিলরুবা, সুরবাহার, একতারা, দোতারা, তানপুরা, রসমঞ্জরী, খঞ্জনি, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, নানা আকারের পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত ঢোলক, তবল, নানা আকারের করতাল, নানা ধরণের বাঁশী—বাঁশের, পেতলের-টিপরাই, আড়, সিধে সাপুড়ের বীণ বা বাঁশী—কত কী!

আরব সাগর, ভূমধ্য সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে হঠাৎ একঝলক যূথী, যাঁতি, চাঁপা, বকুল, গন্ধরাজের সৌরভ যেন মনেপ্রাণে মাতৃভূমির স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে গেল।

এবার চল্লাম মিশরের শিল্প সংগ্রহ দেখতে। প্রথমেই চোখে পড়ল ওদের ভাস্কর্য্য—কাঠের ও পাথরের উপর। খুব সরল গঠনরীতি:—নর-নারীর আকৃতি দেখলে প্রাচীন ভারতীয় সরলীকরণের কথা মনে পড়ে। ওদের রাজারানী আমাদের অজন্তার রাজারানীর মত হাঁটু অবধি কাপড় পরে আছেন দেখলাম। পাথরের উপর খোদাই করা চিত্রধর্মী শিলা-লিপিও অনেক রয়েছে। আর দেখলাম মিশরের অতি বিখ্যাত 'মমী' আর তার কাষ্ঠাধার। কাঠের আধারের ভিতরে নানাছবি আঁকা। তার রং এর ব্যবহার অজন্তার দেয়ালের ছবির রং এর কথা মনে করিয়ে

দেয়। এরাও প্রচুর হলদে রং ব্যবহার করেছেন, আর করেছেন কিছুটা আকাশীনীল, লাল ও ফিকে সবুজ। মমীর সঙ্গে যে সব জিনিষপত্র দেওয়া হত তার কিছু নমুনাও দেখতে পেলাম। মিশরের রাণীদের ব্যবহৃত নানা অলঙ্কার, সিল্কের কাপড়,—আরও কত কি দেখলাম। এক জায়গায় দেখলাম মিশরের এক প্রাচীন মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। ওখানকার প্রাচীন ভাঙ্গামন্দির থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের টুকরা সংগ্রহ করে এখানে এনে সে সব সুনিপুণভাবে জুড়ে এক অপূর্ব প্রাচীন মিশরীয় মন্দির গড়া হয়েছে। তার চারদিকে টলটলে জলের নহর বা খাল। জলের মধ্যে বহু দর্শনার্থীদের ছুঁড়ে ফেলা ধাতুমুদ্রা দেখতে পেলাম। এমন সুন্দরভাবে এ মন্দির গঠন করা হয়েছে যে মনে হয় চার হাজার বছরের পুরানো একটা মন্দিরকে উপড়ে এনে এখানে বসান হয়েছে। দেখছি আর মনে হচ্ছে, সেই যে গল্পের 'টাইম মেসিন'— যাতে চড়ে বর্ত্তমান কালের দু'দিকেই—যতটা ইচ্ছা অতীত বা ভবিষ্যত কালে বেড়িয়ে আসা যেত—সেই টাইম মেসিনে চড়েই যেন চার হাজার বৎসরের প্রাচীন মিশরে পৌঁছে গেছি।

মিশর-মণ্ডপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে অনেকটা সময় লেগে গেল। পিণ্টুর আবার ফেরার তাড়া রয়েছে আজ সন্ধ্যার আগেই তাকে নিউহেম্পসায়ারের পূর্বনির্দ্ধারিত মোটেলে পৌঁছাতে হবে। অনিচ্ছুক চরণদ্বয়কে জোর করে টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

পদব্রজে অনেকটা পথ হাঁটতে হল, গাড়ী কাছেপিঠে রাখার জায়গা আমাদের মিলে নি বলে। গাড়ীতে বসেই মনে হল—অনেকক্ষণ চা পান করা হয়নি। গাড়ীতে বসে বসেই মজুদ ভাণ্ডার থেকে খাদ্য পানীয় বের করে শিশুটিকে খাওয়ান হল,—নিজেরাও কিছু খেয়ে নিলাম এবং সদাবুভুক্ষু গাড়ীটাকেও ভরপেট তেল খাইয়ে নিউইয়র্ক শহর ছেড়ে রওয়ানা হলাম। মন বল্ল—বিদায় নিউইয়র্ক—এই 'দর্শনই তোমার প্রথম ও শেষদর্শন'। অতৃপ্তপ্রাণ মাথা নেড়ে বল্ল— 'কক্ষনো নয়,—'পুনরাগমনায় চ।'



[নিউহেম্পসায়ার—হেম্পটন সমুদ্রসৈকত]

এবার আমরা নিউহেম্পসায়ারে যাচ্ছি। চোখ রইল রাস্তায় আর মন রইল মমীর ঘরে। এ যেন বৃন্দাবনের গোপিনীদের অবস্থা—দেহ ঘরে, মন যমুনাপুলিনে।

নিউইয়র্ক ও ওয়াসিংটনে দ্রষ্টব্যের বা জ্ঞাতব্যের কমতি ছিল না, ছিল সময়ের। পৃথিবী কি বিরাট.—জানার বা দেখার রয়েছে কত! অথচ কত সীমিত আমাদের সময়, সামর্থ্য বা সঙ্কল্পের পরিমাণ! পরিণামে—সীমিত জ্ঞান—সীমিত দর্শন এবং কূপমণ্ডুকত্ব।

নিউইয়র্ক ছেড়ে আমরা ৯৫ নম্বরের রাজপথ ধরে চলেছি। 'ষ্টমফোর্ড' 'নরওয়াক' প্রভৃতি জনপদ পেছনে ফেলে চলেছি,—চোখ দেখছে দুই পাশের দ্রুতধাবমান শহর, প্রান্তর, গাছপালা—মন এখনো ভ্রাম্যমান মিশরের প্রাচীন যুগে।

এখানে দেখছি স্বর্গের ছড়াছড়ি, - প্রথমে পথে পড়ল 'নিউহেভেন' এবং তারপর 'ইষ্টহেভেন';—এই জনপদ দু'টি পার হতে হতেই আঁধার ঘনিয়ে এল। তা ত হতেই পারে: স্বর্গচ্যুত হয়ে আলো কোথায় পাব! আলো থাক আর না থাক—গাড়ী এগিয়ে চলেছে। 'বোষ্টন'কে এড়িয়ে 'ওয়ালথাম'-এ না থেমে 'লেসজিংটন' প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ পার হয়ে চলেছি। আমরা এখন যাচ্ছি 'মেছাচুসেটস্' রাজ্যের ভিতর দিয়ে। 'ওয়েষ্টনিউবারীর পর 'মেরিমেক' নদীর পুল পার হলাম। আর কিছুক্ষণ পরই আমরা 'মেছাচুসেট্স্' রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে 'নিউহেম্পসায়ার' রাজ্যে প্রবেশ করলাম। হেম্পটন বিচে আমাদের পূর্বনির্দ্ধারিত মোটেলে এসে পৌছাতে রাত ৯টা বেজে গেল। আজ প্রায় ৪০০ মাইল গাড়ী চালান হল। মোটেলে পৌছে ঘরের চাবি নিয়ে জিনিসপত্র নামান হল। তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে স্নানটান

করে সবাই কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হলাম এবার নৈশআহারের পালা। মাতা ও কন্যা দ্রুতহস্তে খাবার দাবার গরম করে বাচ্চাটিকে খাইয়ে দাইয়ে সবাইকে পরিবেশন করে নিজেরা ও খাওয়াদাওয়া করে নিলেন।

একটু আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম—গব্যঘৃত, বেগুন ভাজা ও কাঁচা লঙ্কা সহ গরম গরম খিচুড়ি ভোজনের পর মনের ভিতর মিশরীয় দুঃখটা অনেকখানি ফিকে হয়ে এসেছে।

তৃপ্তরসনা এবং অতৃপ্তবাসনা নিয়ে অবশেষে নিউইয়র্ক মিউজিয়ামের আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে কম্বলের তলায় শুয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করে চা পর্ব চুকিয়ে পিন্টু মোটেলের সামনের দোকান থেকে রাস্তার জন্য কিছু কেনাকাটা করে সেই যে গাড়ী নিয়ে ছুট দিল—আর ফেরার নাম নেই! আমরা এদিকে রান্নাবান্না শেষ করে জিনিষপত্র গোছগাছ করে তৈরী, কিন্তু পিন্টু এখনও ফিরল না,—ব্যাপার কী! দুপুর গড়াচ্ছে দেখে শেষ পর্য্যন্ত সবাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে দিলাম। প্রায় বারটা বাজে, বাইরে রিমঝিম বৃষ্টি,—পিন্টু এখনো বেপাত্তা, এমন সময় এক ব্যাগ মাছ হাতে সহাস্য বদনে পিন্টুর প্রবেশ। কী কাণ্ড! এত দেরী করলে কেন? কোথায় গিয়েছিলে? ইত্যাদি এক ঝাঁক প্রশ্নবাণ হাসিমুখে হজম করে পিন্টু মিতাকে বল্ল—'মাছগুলি কাটিয়ে এনেছি, আইসবক্সে ভরে রেখে আমাকে খেতে দাও,—খেতে খেতে সব বলছি।' এই বলে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। খেতে খেতে পিন্টু বল্ল যে আজ বেশী দূর গাড়ী চালিয়ে যেতে হবে না বলে হোটেলের মালিককে বলে কয়ে কালরাত্রেই সে দেরী করে ঘর ছাড়বার সম্মতি আদায় করে নিয়েছিল, —আজ সকালে মাছ ধরার মতলবে মাছ ধরার সরঞ্জাম গাড়ীর পশ্চাতে সর্বদা মজুদ থাকে। তাই সকাল সকাল গাড়ী নিয়ে সমুদ্র সৈকতে চলে গিয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মিলে একটা নৌকা ভাড়া করে গভীর সমুদ্রে—কূল থেকে প্রায় ২০/২৫ মাইল দূরে মাছ ধরতে চলে গিয়েছিল। ধরেও ছিল গোটা বিশ মেকরেল মাছ। তার মধ্যে গোটা চার কাটিয়ে

এনেছে, বাকী সব সহ-মৎস্য-শিকারী এক মৎস্যবিলাসী ইটালিয়ানকে দান করে এসেছে। তারা নাকি মাছের ব্যাপারে বাঙ্গালীদেরও লজ্জা দেয়।

চটপট খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়ীতে মালটাল বোঝাই করে গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে দেড়টা বেজে গেল।

এবার আমাদের রাস্তা যাবে আটলান্টিকের তীর ঘেঁষে। দু'পাশের অতি চমৎকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর জন্য এ রাস্তাটাই পিন্টু বেছে নিয়েছে। আমরা যাচ্ছি ১ নম্বর রাজসরণী ধরে—রাস্তার দু'পাশের দৃশ্যাবলী সৌন্দর্য্যে পয়লা নম্বরের,—তাই কি রাস্তার নম্বরটাও ১ নম্বর!

এক পাশে পাহাড়ের গায়ে পাইনের বন,—তার ফাঁকে ফাঁকে ছবির মত সুন্দর বাড়ীঘর। আর অন্য দিকটাতে ঢালু জমির উপর গাছ-পালার কাঁচা সবুজ,—ঘাসের ফুল, দোকান পাট, আর মাঝেমাঝে দু'একটা বাড়ী ঘর। কোথাও বা এক ফালি সমুদ্র হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠছে। 'পোর্টস মাউথ' পার হবার পর আমরা 'সেলমন ফলস' নদী পার হলাম। এইবার আমরা মেইন রাজ্যের ভিতরে ঢুকলাম। বিদ্যাপতি রাধিকার কচিকৈশোর থেকে পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্য্যের ক্রমপরিণতির বর্ণনা করেছিলেন। মেইনে ঢুকবার পর রাস্তার দু'পাশের সৌন্দর্য্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে বিদ্যাপতির সেই বর্ণনার কথা মনে পড়ল।

অপূর্ব সুন্দর এই মেইন রাজ্য। কোথাও এঁকে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে ঘননীলনীরা নদী,—তার তীর ঢালু হয়ে নদীগর্ভে নেমে গেছে,—কোথাও বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই প্রবল প্রতিবাদের মত খরস্রোতের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। কানায় কানায় ভরা জল। নীল আকাশে ভাসমান সাদামেঘের দল, চতুর্দ্দিকে সবুজ পাইন সিডারে ঢাকা গিরিশ্রেণী,—তার মাঝখান দিয়ে প্রবহমানা নদীর নাতি—ক্ষীণধারা। তীরে তীরে অসংখ্য ঘাসের ফুল—সবুজ আকাশে রঙ্গিন তারার মত ফুটে আছে। নানা জাতীয় মন্দির শীর্ষোপম পাইন ও

শ্বেত কাণ্ড বার্চ্চের চিত্রপ্রতিম শ্রেণীবদ্ধ উর্দ্ধাবলোকন পাহাড়ের মাথায় মাথায়। মনে হচ্ছিল এ কোন রূপকথার রাজ্যে এলাম! দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের মনোহারিত্বে বিমুগ্ধ পিন্টু ত গাড়ী থামিয়ে একাধিক স্থানের ছবি তুলে নিল।

ধীরে ধীরে আটলান্টিক আমাদের ডান দিকে অনেকটা এগিয়ে আসছে।

ছোট্ট মেয়েরা যেমন প্রথমে দূর থেকে,—আড়াল থেকে দেখে; তারপর ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করে একসময় পাশে এসে গায়ে হাত রেখে দাঁড়ায়,—এও যেন তেমনি। আটলান্টিকের সঙ্গে বুঝি আমাদের ভাব জমে আসছে।

রাস্তা ও সমুদ্রের মাঝখানে এখন কোথাও এক ফালি ঢালু ঘাসে-ভরা জমি;—তাতে হয়ত একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ী;—আশে-পাশে নানাজাতীয় পাইনের বন। নীচে রুক্ষ পাথরের গায়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কোথাও বা সমুদ্রের বুকে, তীর থেকে কিছু দূরে—গাছপালা শূণ্য একটা ন্যাড়া পাহাড়;—পাদদেশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অসংখ্য পাথরের স্তূপ;—তাতে আটলান্টিকের সফেন ঢেউ যুগযুগান্ত থেকে মাথা কুটে মরছে। সাদা সমুদ্রপক্ষী সিগালের ঝাঁক উর্ম্মিমুখর প্রস্তরময় বেলাভূমিতে বসে আছে। কেউ কেউ বা ঢেউএর মাথায় উড়ে উড়ে মৎস্যশিকারে ব্যস্ত। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, পাইনের চিরহরিৎ অরণ্য,—বাতাসে হিল্লোলিত নানা বর্ণের অজস্র ঘাসের ফুল,—নীল আকাশে ভাসমান শুভ্রমেঘের দল,—আটলান্টিক মহাসাগর স্নাত ঈষৎ শীতল বায়ুপ্রবাহ,—সন্দেহ হচ্ছে, এ স্বপ্ন না সত্য!

"স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমঃ।"

এই স্বপ্নসম্ভব পরিবেশের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে এক সময় আমরা বার হারবারে এসে পৌছালাম। তখন বাইরে রিমঝিম বৃষ্টি আর বাতাসে সামান্য শৈত্য।

মোটেল আগে থেকেই ঠিক করা ছিল বলে আমরা পথ চিনে চিনে সিধে মোটেলে গিয়ে উঠলাম।

কাল সকালেই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে বলে সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ছাড়া সব কিছুই গাড়ীতে রইল।

কাল আমাদের লম্বা কর্মসূচী। প্রথমেই লঞ্চে করে সমুদ্রভ্রমণ, তারপর বিখ্যাত একাডিয়া জাতীয় উদ্যান দর্শন এবং তারপর ক্যানেডার সীমানায় এক লগ কেবিনে রাত্রি যাপন।

আজ গাড়ী চলেছে মাত্র তিন'শ মাইলের মত; কিন্তু এইটুকুর মধ্যে নয়নানন্দন দৃশ্যাবলী—যা চোখে দেখে ধন্য হয়েছি তা তুলনায় ঢের বেশী। চোখে সে সৌন্দর্য্যের ঘোর এখনও লেগে আছে। এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে মেইনের বন পাহাড় নদী আর সমুদ্রে বিরচিত অপূর্ব দৃশ্যাবলী কল্পনার চোখে দেখতে থাকলাম।

এক সময় মাতা ও কন্যা হেম্পটন বীচে ধরা মেকরেল মাছ রান্না করে বাচ্চাটিকে খাইয়ে দাইয়ে আমাদের খেতে ডাকলেন।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে কম্বলের তলায় যখন ঢুকলাম তখন বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে; বাইরে ত বটেই, ঘরের ভিতরও যেন শীত শীত ভাব। ঘরের তাপ পুনঃনিয়ন্ত্রিত করে চোখবুজে পাইন বন আর সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়ে।



[বার হারবার—একাডিয়া ন্যাশানেল পার্ক—
জেকম্যান পোর্ট পর্ব]

প্রত্যুষে চা-পর্ব শেষ হলে প্রস্তুতি পর্ব শুরু হল। গতরাত্রের রান্নাকরা খাদ্য ফ্রিজে রাখা ছিল ;—গরম করে চটপট সবাই খেয়ে নিলাম। এরই এক ফাঁকে পিণ্টু কোথা থেকে দু'গাঁট ঢেকী শাক নিয়ে উপস্থিত। আমরা ত অবাক ! আমেরিকায় বসে ঢেকী শাক খাব কে কল্পনা করেছিল !

'বারহারবার'-এর খ্যাতি বড়, জায়গাটা ছোট। এ রাস্তা সে রাস্তা একটু ঘোরা ফেরা করে পিণ্টু টাউন পায়ারের কাছে গাড়ী দাঁড় করাল। এখান থেকে প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর আটলান্টিকগামী লঞ্চ ছাড়ে। লাইন দিয়ে টিকিট কেটে আমরা যথাসময়ে লঞ্চে উঠে পড়লাম। লঞ্চটি দু'তলা;—তাতে বাইরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার ভেতরে বসে কাঁচের জানালা দিয়ে দেখার ব্যবস্থাও রয়েছে। ভেতরে সারি সারি বেঞ্চ পাতা;—সেখানে বসে দেখলে কন কনে ঠাণ্ডা হাওয়া এবং উর্মিমালা উত্থিত জলকণার হাত থেকে বাঁচা যায়। ছোট্ট হলেও এটা সমুদ্রগামী জলযান ত বটে,—তাই এ লঞ্চে লাইফবেল্ট, রেডিও যোগাযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমুদ্রগামী জলযানে যা যা থাকার কথা—তা সবই রয়েছে। একজন জাহাজের কর্মী মাই-ক্রোফোন হাতে গাইডের কাজ করে যাচ্ছেন;—কোথা দিয়ে লঞ্চ যাচ্ছে —কোথায় কি দেখতে যাচ্ছি—সেখানকার ইতিহাস—এসব বৃত্তান্ত ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। যাত্রীদের সকলেই ও দেশীয়;—ভারতীয় বলতে কেবল আমরা ও এক শিখ পরিবার। তাঁর স্ত্রী আবার আমেরিকান। তাই হয়ত স-সন্তানসন্ততি তিনি আমাদের সান্নিধ্য যথাসম্ভব বর্জ্জন করেই চল্লেন। তা হোক্—আলাপ নয়-আটলান্টিকের

বুকে ঘুরে ঘুরে দ্বীপগুলির সৌন্দর্য্য সম্ভোগই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে আলাপ থেকেও একেবারে বঞ্চিত হইনি। এক বৃদ্ধা আমেরিকান ভদ্রমহিলা দূরবীণ চোখে লাগিয়ে পক্ষী নিরীক্ষণ করছিলেন। পিন্টু চট পট তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যাগ থেকে একটা সচিত্র পুস্তিকা বার করলেন; ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন কোথায় কোন জাতীয় পক্ষীর দেখা পাওয়া সম্ভব এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে ও দ্বীপের কাছের উড়ন্ত পক্ষীগুলি কোনটি কোন প্রজাতির—তাদের বিশেষত্বই বা কি—এই সব বুঝিয়ে দিলেন। এখানে এক জাতের সিগাল রয়েছে—যাদের দুই পাখার নীচের দিকটা বেশ কাল। আরও কয়েকটি প্রজাতির সিগাল সে দিন তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন।

গাইড বলেছিল বটে যে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এখানে কখনো কখনো শিল, এমন কি তিমিরও সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের Seal করা ভাগ্যে শিল চোখে পড়ল না, চোখে পড়ল শুধু সমুদ্রের বুকে জেগে থাকা শিলাময় শৈলশিখর। আর তিমি?—যে তিমিরে সে তিমিরেই রইল. অবশ্য একটা পাহাড়ের চূড়ায় ঈগলের বাসাতে একটা নিঃসঙ্গ ঈগল পাখী দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল.

সমুদ্রের বুকে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ; সমুদ্রের তাণ্ডবে এক দিকটা নিয়ত তরঙ্গ ভঙ্গে ভগ্ন শিলাময় ও সমুদ্রফেনিল. শৈলসানুদেশ এই দিকটায় বৃক্ষবিবর্জ্জিত;—অন্যদিকটাতে কিন্তু পাইনের ঘন বন। কোথাও তরঙ্গভগ্ন প্রস্তরময় সানুদেশে ছোট বড় কয়েকটি বাড়ী। [illegible]াট বিরাট ধনীব্যক্তিদের সুরম্য গ্রীষ্মাবাস বা প্রমোদ ভবন এখানে অনেক। দূরে একটা ন্যাড়ামাথা শিলাময় দ্বীপ জলের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে;—তাতে অসংখ্য পাখী। আমেরিকান ভদ্রমহিলা বল্লেন—'ওটা হচ্ছে পাখীদের ডিমপাড়ার জায়গা।

বার হারবারে এসে লঞ্চে চড়ে আটলান্টিকের বুকে জেগে থাকা

ছোট ছোট দ্বীপগুলির চার পাশে ঘুরে বেড়াবার মধ্যে একটা আলাদা রস রয়েছে।

একটা খুব ছোট দ্বীপে একটা পুরানো লাইট হাউস দেখতে পেলাম। শুনলাম এটাকে এখনো বহু যত্নে সচল রাখা হয়েছে। বারদ্বীপ, শিপপরকুপাইন,' 'বল্ড পরকুপাইন দ্বীপ, 'বিয়ার দ্বীপ', 'গ্রিনিং দ্বীপ.' 'সাটন দ্বীপ,'—কত দ্বীপই না আমরা দেখলাম! এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে একটা না একটা ইতিহাস জড়িত। কোনোটাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল, কোনোটাতে রয়েছে মদচোলাইকারীদের গোপন আড্ডা, পাহাড়ের গায়ে গোপন সুড়ঙ্গে পলাতক আসামীদের আত্মগোপনের ইতিহাস কোনোটা বা বহন করেছে।

দ্বীপপুঞ্জ পরিক্রমা শেষ করে লঞ্চ নোঙর ফেললে আমরা ধীরে ধীরে নেমে এলাম। কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে নামতে নামতে ছেলেবেলার চাঁদপুর গোয়ালন্দ ঘাটের ষ্টিমারে উঠা নামার কথা মনে পড়ে গেল।

পাশের দোকান থেকে নিয়ম রক্ষার খাতিরে এখানকার স্মারকচিহ্ন স্বরূপ সামান্য কিছু কেনা কাটা করে পিণ্টু বল্ল—"চলুন, এবার একাডিয়া জাতীয় উদ্যান দেখে আসি।" অতি উত্তম প্রস্তাব,—সুতরাং সবাই গাড়ীতে চড়ে বসলাম;—গাড়ী এবার এগিয়ে চল্ল—বিখ্যাত একাডিয়া ন্যাশানেল পার্কের উদ্দেশে।

এই একাডিয়া ন্যাশানেল পার্ক নিয়ে এঁদের গর্বের অন্ত নেই। তিন হাজার একর জুড়ে রয়েছে এই বিশাল পার্ক। গ্রীষ্মকালে নাকি এখানে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড়।

এইখানটার তীরভূমির অরণ্য সঙ্কুল পাহাড় শ্রেণী যেন আটলান্টি-কের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে,—তাতে এক অনবদ্য দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ের উপরেও কোথাও কোথাও রয়েছে বরফগলা জলে সৃষ্ট শান্ত নীলনীরা হ্রদ; কোথাও বা পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসে সমুদ্রকূলে

বালুকাময় বেলাভূমির সৃষ্টি করেছে। প্রস্থে তাদের কৌলীণ্য হয়ত তত নেই ;—তাই বলে জলকেলি, নৌকাবিহার বা মাছধরা অথবা নিছক সমুদ্রস্নানের জন্যও ভিড় নেহাৎ কম নয়।

অনেক স্থানেই তটরেখা প্রস্তরসঙ্কুল ; তার গায়ে সমুদ্রের ঢেউ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে আছড়ে পড়ছে। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই সমুদ্রের বুকে জেগে আছে ;—যেন তারা এক একটা নির্জ্জন দ্বীপ সমুদ্রের উচ্ছল তরঙ্গাঘাতকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যুগ যুগান্তব্যাপী তরঙ্গাঘাতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে কোথাও বা ছোট খাট গুহার সৃষ্টি হয়েছে ;—তাতে সমুদ্র পক্ষীদের নীড়। অবিরাম সমুদ্রগর্জ্জন, সফেন শুভ্র তরঙ্গ ভঙ্গ, উর্ম্মিমালাউৎক্ষিপ্ত শিকরনিকর,—তারই মধ্যে সামুদ্রিক বিহঙ্গমের শুভ্রপক্ষবিস্তার, চকিৎ দিকপরিবর্ত্তন, অনায়াস গগন বিহার, অকস্মাৎ তড়িৎগতিতে অবতরণ করে মৎস্যশিকারের অনবচ্ছিন্ন প্রয়াস। কোথাও বা দুর্গপ্রাকারের মত খাড়া পাহাড়ের সানুদেশ সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ;—যুগান্তরের নিরন্তর সমুদ্র তরঙ্গাঘাতের সহস্রক্ষত লাঞ্ছন তার সর্বাঙ্গে ;—তার ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘিরে সমুদ্রতরঙ্গের সে কী ফেনিল উচ্ছ্বাস! কোথাও বা ক্ষীণ-কটি সমুদ্র-বেলায় ফেনিল তরঙ্গ আদিম যুগের বিরাট সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে,—আবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

নয়নানন্দন দৃশ্যাবলী এখানে যেমন অফুরন্ত—তেমনি রয়েছে অজস্র সূর্য্যাস্তের রঙ্গে রাঙ্গা রক্তিম গলদা চিংড়ির অফুরন্ত ভাণ্ডার। প্রকৃতি-বিলাসী, প্রকৃত বিলাসী অথবা নেহাৎ প্রাকৃত—স্নেক-ভোজন বিলাসীই হোক—সকলের সার্থক স্বপ্ন এই বার হারবার। গ্রীক পুরাণের সার্সির মত মোহিনী এই বার হারবার প্রাণমন হারাবার আদর্শ স্থানই বটে।

বসন্তের শুরু থেকে শরতের শেষ পর্যন্ত—এখানকার বিলাস-প্রেমীরা যে বারবার ভিড় জমান এই বার হারবারে—সেত শুধু এখানকার পর্য্যাপ্ত 'বার' বা পানশালার জন্যই নয়;—সে অর্থে পশ্চিমজগতের সব শহরই

ত 'বারহারবার',—হাজারে হাজারে না হোক শ'য়ে শ'য়ে পানগার বা 'বার' তারা harbour করেন নাকি ?

প্রকৃত রস, প্রকৃতিরস বা প্রাকৃত রস—যে কোনও রসেই চাহিদা মেটাতে 'বারহারবার' কারো কাছে হারবার পাত্র নয়। এমন কি অর্থ-রসই যাদের কাছে পরমার্থ—সেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছেও এ জায়গাটা কল্পতরু বিশেষ। এখানকার সমুদ্র নাকি লাল লাল বিরাট গলদা চিংড়ি ধরার পক্ষে আদর্শ স্থান। তাইত দেখতে পাচ্ছি—সমুদ্র বক্ষে মাছধরা নৌকার নিরন্তর গতিবিধি আর পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেই হোটেলে হোটেলে বড় বড় দাঁড়-ওয়ালা লাল লাল গলদা চিংড়ির ছবি।

গাদা গাদা গলদা চিংড়ির গন্ধে মুখে লালা না ঝরিয়ে আমাদের বর্তমান দ্রষ্টব্য একাডিয়া ন্যাশানেল পার্ক প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করা যাক।

ঘন-সবুজ বনানীর ভেতর দিয়ে চড়াই উৎড়াই ভেঙ্গে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। হঠাৎ এক ফালি নীল সমুদ্র গাছপালার ফাঁক দিয়ে হাজার ফিট নিম্নে ঝলক দিয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পরই দু'পাশের পাইন অরণ্যে সমুদ্র অদৃশ্য। কোথাও বা পাহাড়ের উপরে একফালি কৃষ্ণনীল হ্রদের জল টলমল করছে এখানে বিহঙ্গম বিরল। তবে সবুজ আকাশের স্থানু বিহঙ্গম—বিভিন্ন বর্ণের বনকুসুম সম্ভার এখানে সর্বত্র,—যদিও কুলগর্বে নৈকষ্য কুলীন কেউ নন।

এবার একটি সংরক্ষিত এলাকায় আমাদের গাড়ী থামল; সেখানে একটা মিষ্ট জলের প্রস্রবণ রয়েছে। সেই উপলব্যথিত গতি ক্ষীণধারা স্রোতস্বতীর দুই তীরে সাদা, লাল, নীল, হলদে, গোলাপী, বেগুনী—নানা রং এর অজস্র বনকুসুম-সম্ভার। এখানকার একটি বাগানে নানা জাতীয় স্থানীয় লতা, গুল্ম, ও বৃক্ষরাজি রয়েছে;—পাশে পাশে তাদের নাম, প্রজাতি, গোত্র, জাতি-ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ। দেখা শেষ হলে আবার সবাই গাড়ীতে এসে বসলাম।

চড়াই উৎরাই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিবিড় পাইন বনানীর মাঝ দিয়ে

আমাদের গাড়ী চলেছে। ঘন ঘন সমুদ্রের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে আর বিস্ময়ে আপ্লুত হচ্ছি। মনে মনে সমুদ্র নাগরীকে বল্লাম—

"মুগ্ধজনকে আর কত বিমুগ্ধ করবে!"
"এমনি 'ত বাণ নাশ করে প্রাণ,
কি কাজ লেপিয়া গরলে!"

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে নন্দন কানন ভ্রমণ করা হল। এবার গাড়ী ক্যানেডার দিকে মুখ ফেরাল। পিন্টুর পরিকল্পনা—আজ বিকেলের মধ্যেই ক্যানেডার সীমান্তবর্ত্তী জেকম্যান পোষ্টএর এক লগকেবিনে রাত্রি যাপন এবং সম্ভব হলে অদূরবর্ত্তী হ্রদে মৎস্যশিকার। লগকেবিন আর কিছু নয় আস্ত গাছের গুঁড়িকে দু,ভাগ করে চিরে তা দিয়ে ঘরের বাইরের দিকের দেয়াল তৈরী করে যে বাড়ী করা হয় তার নামই লগকেবিন। বাইরে থেকে দেখতে গ্রাম্য হলেও ভেতরে কিন্তু অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম থাকতে বাধা নেই।

এখন আমরা দুই নম্বরের রাজবর্ত্ম ধরে চলেছি। সমুদ্র এখন নিরুদ্দেশ। মাঠ বাট পেরিয়ে আমরা 'বেঙ্গোরে' পৌঁছালাম। এ যেন ভূরিভোজনের পর নিশিপালন;—চতুর্দ্দিকের দৃশ্যের সে মোহিনী মায়া আর নেই;—একেবারে সাদামাটা চেহারা।

সাদামাটা দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে পিটস্‌ফিল্ড অতিক্রম করে 'ক্লিনটন' এ চলে এলাম এবং ক্লিনটনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিমেষে আমার টন টন দুঃখ clean ভুলিয়ে দিল। প্রসাধিতা প্রকৃতি দেবী আটপৌরে শাড়ী ছেড়ে আবার তার পূর্বের মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। —পাহাড়ের গায়ে গায়ে সেই পাইনের সবুজ সমারোহ; —তেমনি ঘাসের ফুলে-আলো সানুদেশ ;—কোথাও বা ছোট ছোট কৃষ্ণনীলনীর হ্রদ, আর তার জলে প্রতিবিম্বিত আকাশের ঘননীল।

একটি নদী সেই কবে থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ছোট্ট নদী, আঁকাবাঁকা তার ধারা,—দুই তীরে গভীর সবুজ পাইন, ওক, বার্চ্চ সিড়ারের বন। বড় স্নিগ্ধ, বড় সুন্দর! তার তীরে খঞ্জনা নাই বা

নাচল, ন্যাইবা হল অঞ্জনা তার নাম ;—তবুও খঞ্জন তার গতিছন্দে,—অঞ্জন তার নীল নয়নে। আমার ছোট পৌত্রী মিনির মতই এই Mini নদীটি যেন বৃদ্ধ ঠাকুরদার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল সারাক্ষণ ;—হঠাৎ বাঁয়ে ঝলক দিয়ে কখনো সামনে প্রশান্ত নয়নে, কখনো পাহাড়ের বাঁকে মুখ লুকিয়ে—কখনো বা গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে থেকে থেকে কলকণ্ঠে হেসে উঠছিল। অবশেষে এই মিষ্টি-কেন্নেবেক নদীর সঙ্গে অন্তিম বিচ্ছেদ ঘটল 'ওয়েস্টফোর্ক'এ এসে। সপ্তপদ এক সঙ্গে গেলেই নাকি বন্ধুত্ব হয়। 'মুজহেড' দুহিতা দক্ষিণবাহিনী এই নদীবালিকার সঙ্গে একসঙ্গে বহু পথই ত অতিক্রম করা হল। তার অদর্শন যেন আত্মীয় বিয়োগ।

আমরা এবার পারলিন হ্রদের দিকে এগুচ্ছি। দু,পাশে ঘন বন, মাঝে মাঝে জনপদানু আর তাদের সুন্দর শান্তিময় পরিবেশ ;—মাঝে মাঝে পাহাড়ের মাথায় ছোট খাট কাঠের বাড়ী। এও কি কম সুন্দর।

পথ ক্রমেই 'চড়াই' হয়ে উঠছে: ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার মৃদু আলোয় নাতিমৃদু শীতল বাতাসের স্পর্শে মনে হচ্ছিল ক্যানেডা বোধ হয় খুব দূরে নয়। 'এণ্ডিয়ান' হ্রদ পার হয়ে 'উডপণ্ড' এর কাছাকাছি হল আমাদের গন্তব্য স্থল—'জেকম্যান পোষ্ট,। জায়গাটা বেশ উঁচু ,—সমুদ্র থেকে ১২১৯ ফিট উচ্চ ;—এই মধ্য মে তেও খুব ঠাণ্ডা। ক্রমবর্দ্ধমান ঠাণ্ডা দেখেই আন্দাজ করেছিলাম—ক্যানেডার সীমানায় আমরা পৌঁছে গেলাম বলে। সত্যিই তাই ;—দেখতে দেখতে 'জেকম্যান পোস্ট'এ, পৌঁছে গেলাম।

রাস্তা আর বাড়ীর নম্বর খুঁজে খুঁজে পিণ্টু পূর্বনির্দ্ধারিত লগ-কেবিনের সামনে এসে গাড়ী দাঁড় করাল। একটা বড় গোছের দিঘীর মত, ধর, কুমিল্লার রাণীর দিঘীর মত বড় একটা হ্রদ, তার ঠিক পাড়েই আমাদের আজ রাতের পান্থনিবাস এই লগ কেবিনটি। হোটেলের মালিক অনুপস্থিত ;—তাই তার গৃহিনীর কাছ থেকে ঘরের চাবিটা উদ্ধার করে দরজা খুলে জিনিষপত্র লগ কেবিনস্থ করা হল। অতঃপর ভদ্রমহিলার কাছে মৎস্যশিকারের অভিলাষ জ্ঞাপন করাতে তিনি পিণ্টুকে বল্লেন—

যে তাঁর স্বামী বাড়ী থাকলে মাছধরার খুবই সুবিধা হত ; কারণ তাঁর নিজেরও মাছধরার খুব শখ। সে দিনই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ধারে কাছের কোনো হ্রদে মাছ ধরতে গেছেন। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে ; তা দেখে তিনি বল্লেন—"এই বৃষ্টিতে একা একা তুমি কি করে মাছ ধরতে যাবে! বরং ঘরে সদ্যধরা 'সেলমন' মাছ রয়েছে ; তারই একটা দিচ্ছি, তাই রেঁধে আজ রাতটা খাও।"

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা ; ঘরের ভেতরেও কিছু কম নয়। তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা সক্রিয় করাতে ঘরটা ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠল।

গরম গরম চা পান করে চাঙ্গা হয়ে আমি দৌহিএটির সঙ্গে ছুটো-ছুটি করে খেলার ছলে তাকে সামলাচ্ছি আর ও দিকে মাতা কন্যা ও জামাতা মিলে মহা উৎসাহে রন্ধনকার্য্য সমাধান করছেন।

যথা সময়ে টেবিলে গরম গরম খাবার পরিবেশিত হল,—কাগজের প্লেট আর কাগজের গ্লাশে ; কারণ এতে ধোবার বালাই নেই,—নোংরা ফেলার ড্রামে ফেলে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে গেল।

ওরা খুব তৃপ্তি করে দামী নামী সদ্যধরা সদ্যরান্না করা 'মনপছন্দ' বিনা Sale-এর 'সেলমন' মাছ খেল ; আমরাও বিশুদ্ধ স্বদেশী পদ্ধতিতে সুদূর ক্যানেডার প্রান্তবর্ত্তী এক লগ কেবিনে বসে ঢেকী শাক দিয়ে গরম গরম 'টেক্সামতি' চালের ভাত খেলাম,—তাও কিছু কম নয়। ভাবছ 'টেক্সামতি' চাল আবার কি জিনিষ—তাই না? এ দেশের টেক্সাস অঞ্চলে আমাদের দেশের বাসমতি চালের মত এক রকম লম্বা লম্বা সরু চাল হয়,—স্থানীয় বাঙ্গালীরা আদর করে তার নাম রেখেছেন 'টেক্সামতি'।

ভোজন পর্ব ত শেষ হল ;—এবার ভজন পর্ব,—সেটা কম্বলের তলায় শুয়েই করা ভাল ; যা শীত! কাল আবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, যত শীঘ্র সম্ভব ক্যানেডা যাত্রা করা হবে ;—সেখানে অনেক জিনিষ দেখার,—অবাক হয়ে ক্যাবাক্ (Quebec) দেখব, 'মণ্টরিয়েল' দেখে মনটা বলবে—একি real! আরও কত কি! তবে আজ ৩/৪শ মাইল ভ্রমণের মাধ্যমে যা দেখা হল—তাও কিছু কম নয় ;—আমি ত মনে করি—'অমূল্য'।

[ক্যানেডা-ক্যাবেক-মণ্টরিয়েল-সেণ্ট লরেন্সনদী-কর্ণওয়াল পর্ব]

কর্ণোয়াল, ক্যানেডা

শ্রেষ্ঠতম এলার্মঘড়ি হচ্ছে আমাদের অবচেতন মন। কোনো এলার্ম ছাড়াই পরদিন খুব সকালেই সকলের ঘুম ভাঙ্গল। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যখন যাত্রা করা হল তখন বাতাসে তীক্ষ্ণ হিমেল স্পর্শ, ঘাসে ঘাসে প্রতি শিশির-বিন্দুতে বিম্বিত প্রভাত সূর্য্য ; গাছের মাথায় মাথায় সোনার আলোর চুমকি, আর ঝিলের জলে কাঁচা সোনার ঝিলিক।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই আমরা ক্যানেডার সীমানায় পৌঁছে গেলাম। জামাতা কন্যা ও দৌহিত্রটি আমেরিকার অস্থায়ী বাসিন্দা বলে ক্যানেডার সরকারী কর্মীরা কোনো ঝামেলা না করেই ওদের ছেড়ে দিল। ভ্রাম্যমাণ ভারতীয় বৃদ্ধবৃদ্ধাকে অবশ্য তাদের অধিকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল এবং পাশপোর্ট ও ভিসা দেখিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করে তবে নিষ্কৃতি মিলল। তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি ফরাসী ভাষায় না বলে পরিস্কার ইংরেজীতেই "আপনাদের ভ্রমণ আনন্দময় হোক" বলে বিদায় জানালেন। ক্যাবেক প্রদেশটা আবার ফরাসী ভাষাভাষী, অণ্টারিওর মত ইংরেজীভাষী নয়।

আমাদের গাড়ী এবার ক্যানেডার রাস্তা দিয়ে চলছে। দিগন্ত এখানে অনেক বিস্তৃত। সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালু জমি দিক চক্রবাল-রেখায় গিয়ে ঠেকছে। রাস্তাঘাট পরিস্কার ঝকঝকে,—তবে সম্পূর্ণ জনহীন। দু'পাশের জমি ঢেউ-এর মত উঠতে উঠতে নামতে নামতে দিগন্তে ধাবমান। সবুজ সুডৌল পাহাড়ের গায়ে ২/৪টি ছিমছাম সুন্দর বাড়ী। চাষ আবাদ অতি সামান্য. দিগন্ত বিস্তৃত ঢালু ঘাসে ভরা সবুজ

প্রান্তরে চাষবাসের চিহ্ন প্রায় অনুপস্থিত। 'আর্মষ্ট্রং'-এর কাছে যখন পৌছান গেল. তখন আমরা 'লিনিয়ারে' নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি; ছোট্ট নদী. তাতে কানায় কানায় ভর্ত্তি জল। 'গ্রাণ্ডিকুবে' পার হবার পর রাস্তা 'চৌড়িয়ারে' নদীর পাশ দিয়ে চল্ল। এখানেও দুই তীরে সবুজের সমারোহ। এখানকার বেশীর ভাগ নদীই প্রসিদ্ধ সেণ্ট লরেন্স নদীর উপনদী। এই নদী পার হয়ে আমাদের রাস্তা গেছে আমাদের গন্তব্য স্থান ক্যাবেকের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ক্যাবেক শহরের শহরতলিতে পৌছে গেলাম।

আমাদের সর্বপ্রথম দ্রষ্টব্য 'সেণ্ট এন্নি দা রাপ্রে'। সেটা আবার শহর থেকে বেশ দূরে, যেতে হবে সেণ্ট লরেন্স নদীর পাশ দিয়ে। এ সব পিণ্টুর আগের দেখা। দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে গির্জ্জার সোনালী চূড়া দেখিয়ে বল্ল—"ওখানটাতেই আমরা যাচ্ছি।" সেণ্ট লরেন্স নদীর পাশ দিয়ে নদীর দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এক সময় আমরা গির্জ্জার এলাকায় পৌছে গেলাম।

গাড়ীটাকে একটা ভাল মত জায়গায় দাঁড় করিয়ে আমরা গির্জ্জাটি দেখতে গেলাম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মর্মর মূর্তি বসান রয়েছে। মূর্তিগুলি দেখার জন্য আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়ের সানুদেশ বেয়ে বেয়ে পথ চলেছে উপরে অবস্থিত গির্জ্জাটির দিকে। সেখানে যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণদানের ঘটনাবলী সুন্দর সুন্দর পাথরে খোদাই করা মূর্তির মাধ্যমে পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। অতি সুন্দর ভাবব্যঞ্জক এই মূর্তিগুলি: কোমরে দড়ি বাঁধা যীশু সিপাহী সান্ত্রী পরিবৃত হয়ে নিজের ক্রুশ নিজেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে পড়ে গেলেন, সৈন্যেরা তাড়না করতে লাগল,—আবার পড়ে যাওয়া,—আবার প্রহার করে দাঁড় করান, অকথ্য অত্যাচার, এরই মধ্যে ভক্তিমতী রমনীদের সান্ত্বনা দান, আশীর্বাদ করা,—এবং শেষ পর্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দুইজন সাধারণ অপরাধীর সঙ্গে প্রাণদান। এ সব দেখতে দেখতে স্মৃতি ভারাক্রান্ত মন কোন সুদূর অতীতে চলে যায়।

এ সব বিষয়বস্তু নিয়ে মধ্যযুগের বহুবিখ্যাত ছবি ওয়াসিংটনেরও নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে অতি-সম্প্রতি দেখে এসেছি। আজ মর্মরমূর্তির মাধ্যমে তার আর এক ধরণের রূপায়ন প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম।

মনে হল যুগে যুগে মহামানবেরা আসেন,—অবতার পুরুষেরা ধরার ধূলিতে অবতীর্ণ হন আর অকথ্য নির্য্যাতনের বিনিময়ে দিয়ে যান অমূল্য আত্মিক সম্পদ।

তাই দেখতে পাই, যীশুর মৃত্যুর পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রেমের বাণীবাহক তাঁর খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপে একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কেন এমনটা হয়?

কোনো মহামানব কোনো মহৎ আদর্শের জন্য যদি স্বেচ্ছায় আত্ম-বলিদান করেন তা হলে সেই আদর্শ অতি দ্রুত দেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়। যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রী মহাকাব্যে বলেছেন:—

"He who found his identity with God
Pays with his body's death his soul's Vast light
His knowedge immortal triumphs by his death.
... ...
He dies that the world may be new-born and live."

অর্থাৎ—"যিনি ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন—আত্মার অসীম আলোকের মূল্য পার্থিব দেহের মৃত্যু দিয়ে তাঁকে পরিশোধ করতে হয়। তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহের মৃত্যুর মাধ্যমেই তাঁর অবিনশ্বর জ্ঞানের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

... ...

পৃথিবীর নবজন্ম ও নবীন জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেন।"

সুদূর অতীত বিহারী ভারাক্রান্ত মনটাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনাই হয়ত বর্তমানে শ্রেয়।

চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছি—নীল আকাশের পটভূমিতে সূর্য্যকরোজ্জ্বল গির্জ্জার সোনালী চূড়া;—বাইরে প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত ঠাণ্ডা হাওয়া,

পাহাড়ের সানুদেশস্থ পাইন ও সিডারের বনে তার দোলা লেগেছে,—ঘাসের সবুজ গালিচার রঙ্গীন ফুলের কাশ্মীরী কাজ; দূরে সেন্ট লরেন্স নদীর নীলধারা। সব কিছুই আজ মনটাকে যেন উদ্ভাস করে দিচ্ছে।

এবার নীচে অবতরণের পালা;—আরও দ্রষ্টব্যস্থান আমাদের নীরবে হাতছানি দিচ্ছে;—বিশেষ করে 'সাইক্লোরামা'।

এটা এখানকার অবশ্যদ্রষ্টব্য স্থান। সারা বৎসর এটা খোলা থাকে না; এখানকার প্রচণ্ড শীতের জন্য প্রতি নভেম্বর মাসেই এটা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এই সাইক্লোরামা তৈরী হবার পর থেকেই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার টানে হাজারে-হাজারে দর্শক ও তীর্থকামী লোকেরা এখানে প্রতিবৎসর ভিড় জমান। এটি একটা গম্বুজওয়ালা গোলাকার বাড়ী। প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী পলফিলিপ্পোতে (?) ও তাঁর পাঁচ শিষ্য এখানে এক আশ্চর্য্য মায়াময় রাজ্য সৃষ্টি করেছেন। যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার দিনের জেরুজেলামের সমস্ত ঘটনাবলী এখানকার ছাদের গায়েও চতুর্দিকের গোলাকার দেয়ালে এমন ভাবে এঁকেছেন যে একটা বিশেষ ভাবে নির্মিত পাটাতনের উপর দাঁড়ালে দর্শকেরা অনুভব করেন যেন তারা সে দিনকার জেরুজেলাম শহরে উপস্থিত এবং সেই নিদারুণ দিনের ঘটনাবলী তাদের চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়ে।

এই দেয়ালগুলির উচ্চতা ১৪ মিটার ও পরিধি ১১০ মিটার। প্রায়ান্ধকার এক বিশেষ পাটাতনে দাঁড়ালে চোখের সামনে ভেসে উঠে—দু'হাজার বছরের পুরাণো জেরুজেলাম শহর, তার হাটবাজার, বণিকদের পণ্যবাহী উট আর গাধার সারি, তাদের তাঁবু, নগর প্রাকার, শহরে সৌধশ্রেণী ও অন্যান্য অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, পুরোহিতের প্রাসাদ, জেরুজেলামের প্রাচীন মন্দির, যাফার তোরণ, বধ্যভূমি, কর্মরত সৈনিক দল, উচু-নীচু জমিতে ও শহরের আশে পাশে নানা জাতির লোকের ভিড়,—আর কত বিচিত্রই না তাদের মুখের ভাব। কেউ শোকার্ত, কেউ কেউ মজা দেখছে, কেউ বা মর্মাহত। এদের মধ্যে ভক্তি-

সম্পন্ন নরনারীও রয়েছেন। আকাশে ঘোর ঘনঘটা, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ স্ফুরণে দূর দিগন্তে নীল গিরিশ্রেণীতে নীলাভ আলো। এই দুর্যোগভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দর্শকদের মনে হয়—এক মহামানবকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করার প্রতিবাদে বিশ্বপ্রকৃতি যেন এই আসন্ন অন্ধকারে এক অভাবনীয় দারুণ দুর্যোর্গ ঘটাতে যাচ্ছেন। কী আশ্চর্য্য জীবন্ত এই দৃশ্য! এ অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়,—এ যেন কল্পনার নয়—সত্যি সত্যি দু'হাজার বৎসরের পুরানো পৃথিবী পরিভ্রমণ।

যীশুখৃষ্টের এই আত্মবলিদান সে যুগের মানুষকে এক শ্বাসরোধকারী বর্বরতা থেকে মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Thoughts and Aphorism গ্রন্থে লিখেছেন :—

"Chrlst from his cross has humanised Europe."

অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট ইয়োরোপকে বর্বরতা থেকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

যীশুখৃষ্টের মহান মৃত্যুর বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রী মহাকাব্যে লিখেছেন :—

"The son of god born as the son of man.
Has drunk the bitter cup, owned God head,s debt
The debt the eternal owes to the fallen kind
His Will has bound to death and struggling life
That yearns in vain for rest and endless peace.
Now is the debt paid, wiped off the Original score.
The eternal suffers in a human form,
He has signed salvations testament with his blood :
He has opened the doore of his undying peace
The Deity Conpnsates the creature's claim,
The Creatcr bears the law of pain and death ;
A retribution smites the incarnate God.
His love has paved the mortal's road to Heaven :
He has given his life and light to balance here
The dark account of mortal's ignorance.

It is finished, the dread mysterious sacrifice,
Offereed by God's martyred body for the World ;
Gethsemane and calvary are his lot,
He carries the cross on which man's Soul is nailed ;
His escort is the curses of the crowd ;
Insult and jeer ard his right's acknowlegeement ,
"Two thieves slain with him mock his mighty death.
He has trod with bleeding brow the saviour's way.
He who has found his identity with God
Pays with the body's death his soul's Vast light.
His knowledge immortal triumphs by his death.
Hewn, quartered on the scaffold as he falls
His crucified voice proclaims "I Iam God."

—Savitri—Book Six—Canto two

Centenary Edition, Aug. 15. 1972

এর ভাবানুবাদ নিয়ে দেওয়া হল :—

শুধু শান্তি অনিবার, অবসর এক পলকের,
তারি লাগি লালায়িত পার্থিব জীবন—
শমন নিগড়ে বদ্ধ যুপকাষ্ঠে পশুর মতন ;
কী বিপুল ব্যর্থ চেষ্টা আগ্রহ আকুল।
ধরণীর ক্লিষ্টপ্রাণে প্রতিহিংসা জাগে,
তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন হানে "হে স্রষ্টা ! শুধাই—
সৃজি এই দুঃখ তাপ দুঃসহ দহন—
দুঃখ দিবে শুধু তুমি ? করিবে না ভোগ ?"
মর্ত্ত্যের মাটিতে তাই অবতীর্ণ তিনি
ভগবান-পুত্র যিনি—নরপুত্ররূপে ;
নিঃশেষে শোধিতে যত স্রষ্টার সে ঋণ
অজ্ঞানান্ধ মানবের কাছে।
জগতের যাবতীয় দুঃখ গ্লানি, তাপ,—

মানবের দেহ ধরি সহিলেন তিনি ;
হৃদয়ের রক্ত দিয়া মুক্তির দলিলে
নিজ হাতে দিলেন স্বাক্ষর।

নিঃশেষে হইল শোধ স্রষ্টার সে ঋণ
মানবের কাছে,—নিজ বক্ষের শোণিতে
তাই বুঝি তৃপ্ত এতদিনে
সাস্তের 'সাইলক'।

মন্থিত ধরার চিত্তসমুদ্রউত্থিত
যত হিংস্র হলাহল করিলেন পান
ত্রাণকর্ত্তা নীলকণ্ঠ সম।

তাঁহারি অসীম প্রেম করিল সুগম
মর্ত্ত্যের জীবের তরে অমর্ত্য সরণী।

অজ্ঞান আঁধারাবৃত দুর্বহ যে ভার—
লঘুতর করিলেন তারে—
জ্ঞানোজ্জ্বল নিজ দেহ বলিদান দিয়া।

'জগৎ-হিতায়' তাঁর এ মৃত্যু মহান।

ভয়মিশ্র রহস্যেতে ঘেরা
অভিনব দিব্য যজ্ঞ এক
সম্পূর্ণ হইল তাঁর পূর্ণাহুতি দানে
আপনার দিব্য-নিভ পার্থিব দেহের।

ক্রুশবিদ্ধ মানবাত্মা স্কন্ধে যিনি করেন বহন-
তাঁর ভাগ্যে অপেক্ষিছে মশানও ক্রুশ,
তীক্ষ্ণ শ্লেষ,—নির্য্যাতনজ্বালা।

শেষযাত্রা তাঁর চলে বধ্যভূমি পানে,—
সঙ্গী তার অজ্ঞ জন হৃদয় উত্থিত
অভিশাপ বাণী।

তাঁর দিব্য অধিকার ? স্বীকৃতি তাহার
রূঢ় অপমান আর শ্লেষ, উপহাস।
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত যে দুইটি তস্কর—
এক সাথে ক্রুশবিদ্ধ হবে তিন জনা—
তারাও বিদ্রূপ হানে মহামানবের
এই মহান মৃত্যুকে।
মুক্তিসরণীর যিনি পুরোগ মহান
কণ্টকে আকীর্ণ তাঁর রক্তক্ষরা পথ,
ভালে আঁকা শোণিত তিলক !
ধন্য যাঁরা একাত্মতা লভি,
ভগবান সনে—
মৃত্যু মূল্যে কিনিতেই হয় তাহাদের
আত্মার সে মহান আলোক।
অবিনাশী তাঁর দিব্য জ্ঞানের বিজয়
পার্থিব দেহের মৃত্যু মূল্যরূপে দিয়া
ক্রয় তাঁকে করিতেই হয়।
যদিও মশানে ক্রুশবিদ্ধ দেহ তাঁর,—
তবু কণ্ঠে অমোঘ ঘোষণা—
"এই সেই ; আমিই ঈশ্বর।"

দর্শন শেষ হল, সিঁড়ি বেয়ে আমাদের স্থূলদেহ সামান্য কয়েক মিনিটে নেমে এল দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান পার হয়ে এই বিংশ শতাব্দীতে ; কিন্তু মন কি পারে সেই স্মৃতি ভুলতে এত সহজে এত অল্প সময়ে।

ভারাক্রান্ত মনে সবাই মিলে সেণ্টলরেন্স নদীর তীরে কিছুটা ঘুরে বেড়ালাম।

ঘড়ির কাঁটার মন বলে আপদটা নেই বলে সে কোনো কিছুর জন্য বসে থাকে না, চলতেই থাকে। এ দিকে সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে

পিণ্টু স্মরণ করিয়ে দিল ঐতিহাসিক ক্যাবেক শহরটা দেখে আসার কথা। অগত্যা সবাই ফিরে এসে গাড়ীতে চেপে বসলাম।

ঘিঞ্জি পাহাড়ী শহর,—অনেক অলিগলি ঘুরে খাড়া পাহাড়ী রাস্তায় চড়াই উৎড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পুরাণো শহরে প্রবেশ করতে হল। চারিদিকের প্রাকার প্রায় সাড়ে তিন মাইল লম্বা লর্ড ডাফরিন ক্যানেডার গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে এই পুরাণো দুর্গপ্রাকারের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হলেন। মধ্যযুগীয় পুরাতন নগরদ্বারগুলির সংস্কার সাধন হল; কোথাও পরিবর্তন কোথাও বা পরিবর্দ্ধন করা হল। এখানে একটা চওড়া জায়গা ছিল, সেখান থেকে বহুনিম্নের শহরের নীচের দিকের অঞ্চলও সেন্ট লরেন্স নদীর মনোহর দৃশ্য খুব ভাল করে দেখা যেত। তিনি এসে এটাকে আরো অনেকটা বড় করে দিলেন।

এই শহরের উর্দ্ধাংশের খাড়া পাথুরে রাস্তায় গাড়ীতে না চড়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানই অনেক ভাল। খাড়া সঙ্কীর্ণ রাস্তা, দু'পাশে পুরাণো গির্জা সৈন্যাবাস, প্রাচীন যুগের বাড়ী সব। আর্টিলারি পার্ক সেন্ট জনস্ গেটের ভিতরেই অবস্থিত। সাধুর নামের আড়ালে কামান বন্দুক! যাক্‌গে চোখ বুলিয়ে চলে এলাম। এবার চল্লাম "দি সাইটাডেল" দেখতে। এটায় সেন্ট লুই ছাড়িয়ে সেন্ট লুই গেটে। সপ্তদশ শতাব্দীর একটা সৈন্যাবাস এখানে ছিল; ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে "দি সাইটাডেল" এখানেই তৈরী হল। এখানে রয়েছে সারি সারি কামান, সৈন্যাবাস ইত্যাদি ইত্যাদি। হাঁ,—মানছি, ইতিহাসের দৃষ্টিতে মূল্য হয়ত কিছুটা রয়েছে। তবে আমরা অনেক বেশী আনন্দ পেলাম উঁচু থেকে নীচের পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছবির মত শহরগুলি আর সৌম্য সেন্ট লরেন্সের প্রশান্ত প্রবাহ দেখে। কী অপূর্ব সুন্দর এই দৃশ্য। স্মৃতি রক্ষার্থে পুরাণো প্রাকারে দাঁড় করিয়ে আমাদের কয়েকটা ছবি তোলা হল।

এখানে নাকি খুব মজার একটা রাস্তা রয়েছে। সেখানে সব শিল্পীদের আস্তানা;—রাস্তার পাশে বসে তাঁরা গান করেন, বাজনা বাজান, ছবি আঁকেন ইত্যাদি। ইচ্ছা ছিল একবার নিজের

চোখে দেখে আসব। জানিনা শিল্পীরা সেদিন সেখান থেকে কেন উধাও।

যাক্‌গে—শিল্পী আর তাঁদের শিল্পের সাক্ষাৎ নাই বা হল। কিছুটা ঘুরে ফিরে আবার সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নীচে নামা হল এবং সবাই মিলে গাড়ীতে গিয়ে বসলাম।

আমরা এবার সেণ্ট লরেন্স নদীর পুল পার হয়ে ২০ নম্বর রাজপথ ধরে চল্লাম,—ক্যাবেক ছেড়ে মণ্টরিয়েল-এর উদ্দেশে।

গড়ান জমি,—কোথাও উঁচু কোথাও নীচু,—দুধারে সবুজ গাছপালা নাতিঘন বন,-চষামাঠ দু,ধারে দেখতে পাচ্ছি জায়গায় জায়গায়। আমাদের রাস্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেণ্ট লরেন্স নদীর পাশ দিয়ে চলেছে। 'সেণ্ট এপোল্লিনেয়ার' এ এসে নদীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল। আবার শুরু হল সেই ঢেউ খেলান হাতির পিঠের মত সুডৌল সবুজঘাস ও ফুলেভরা তৃণ কীর্ণ প্রান্তর। কোথাও বা কর্ষিত,—তাই বাদামী রং এবং কোথাও শস্যক্ষেত্র, খামার,-মাঠে দু'চারটা হৃষ্টপুষ্ট গরু চরছে।

২০ নম্বর রাজপথ ধরে এখনও চলেছি। পথে 'সেণ্ট ইউজেনি' নদী পার হলাম। মণ্টরিয়েল আর ও ১০০ কিলোমিটার দূরে। দু' পাশের পাইন বনের মধ্যে চিত্রার্পিত দু'চারটা বাড়ী ঘর। উইস্‌কনসিন এর মত সাইলো এখানে দেখতে পাচ্ছিনা, ক্ষেত খামার চাষবাসও তত চোখে পড়ছে না;—লোক বসতি খুবই কম। লোকের বসতি যা কিছু তা শহরগুলির চার পাশে।

মণ্টারিয়েল ভাল করে দেখতে হলে কাল টরেণ্টো পৌঁছান অসম্ভব। তাই ঠিক হল—মণ্টরিয়েলে না থেকে অন্য কোথাও রাত্রিবাস করা হবে এবং আড়চোখে মণ্টরিয়েল দেখেই তৃপ্ত থাকতে হবে। সেণ্ট লরেন্স নদী এবং শহরের বেশ কিছু প্রসিদ্ধ স্থান গাড়ীতে বসে বসেই দেখা সম্ভব। সুতরাং গাড়ীতে বসে বসেই প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে চা এবং কুকি অর্থাৎ বিস্কুট সম্ভোগ চলতে থাকল।

গাড়ী চালাতে চালাতে পিন্টুর চোখে ঘুম আসছিল;—সেটা অত্যন্ত বিপদজনক। তাই মিতাকে গাড়ী চালাতে বলা হল। কিন্তু দৌহিত্রটি নেহাৎ শিশু,—মা'র গলায় জেঁাকের মত আটকে আছে,—কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা ঘুম তাড়াতে গান গাওয়াই ঠিক হল। গাড়ীতে কাক তাড়ানো চেহারা ও ঘুম তাড়ানো গলার দুর্লভ অধিকারী আমি স্বয়ং উপস্থিত; তবুও মিতাকেই গাইতে বলা হল। মিতা গান শুরু করল,—কখনো মীরার ভজন, কখনো বা রবীন্দ্র সঙ্গীত। প্রথমটার সূত্রধর আমি এবং দ্বিতীয়টার গৃহিনী। সুতরাং শেষ পর্যান্ত সমবেত কণ্ঠেই গান চলতে লাগল। প্রায় হিন্দি সিনেমার রাজা, প্রজা, উজীর, নাজীরের একই সঙ্গে গেয়ে উঠার মত শ্বশুর, শাশুড়ী, জামাতা, কন্যা— সবাই এক সঙ্গে গাইতে গাইতে চল্লাম। ভাগ্যিস এয়ারকণ্ডিশান্ড গাড়ী বলে আওয়াজ বাইরে যাচ্ছিল না! এক সময় দৌহিত্রটিও আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলালো। বহুক্ষণ সহ্য করে থাকার পর এতক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাটা মোটেই দোষের নয়। অগত্যা আমরা থামলাম—কিন্তু তার কান্না থামল বেশ কিছুক্ষণ পর।

'পানা আর রোগা' 'মাইফেল' খতম—হতে হতে দূর দিগন্তে মণ্টারিয়েলের সৌধশ্রেণী দেখা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সেণ্ট লরেন্স নদীর দেখা পেলাম। অসংখ্য উড়ালপুল পার হচ্ছি:—আমরা এখন মণ্টরিয়েল শহরের একপাশ ঘেঁষে যাচ্ছি এবং পথের ধারের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিচ্ছি। আমাদের রাস্তা আর শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—সেণ্ট লরেন্স নদীর বিশাল ধারা। যেখানে 'এক্সপো' হয়েছিল সেই স্থানটি গাড়ী থেকেই দেখা গেল। আরও দেখলাম ওলিম্পিক ষ্টেডিয়াম আর আকাশের পটে চিত্রার্পিত বিখ্যাত মণ্টরিয়েল শহর। রাস্তার পাশে গাড়ী থামিয়ে আমরা একাধিক জায়গার ছবি তুলে নিলাম। এবার সেণ্ট লরেন্স নদীর বিশাল পুল পার হয়ে যাচ্ছি। পুলের উপর দিয়ে যেতে যেতে দৃশ্যপটের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে চলন্ত গাড়ী থেকে ও কয়েকটা 'স্নেপসট' নেওয়া হল। অতি মনোহর দৃশ্য এখানকার।

পুল পার হয়ে পড়া গেল উড়ালপুলের পাল্লায়; একটা শেষ ত আর একটা শুরু। অনেকটা গিয়ে তবে শহরের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলাম। একটা জায়গায় গাড়ীতে পেট্রোল ভরে নিয়ে মানচিত্র দেখে একটা রাত্রি-বাসের উপযুক্ত মোটেল নির্বাচন করা হল। ঠিক হল কর্ণোয়ালের একটা মোটেলে রাত্রিবাস করা হবে।

গাড়ী ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেণ্ট লরেন্স নদী আবার নয়ন-গোচর হল;—যেন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলনের আনন্দ পেলাম। মাঠ, ঘাট, নদী, বন—সবুজে সুনীলে বিরচিত স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের পরি-বেশের ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে। অচিরেই ক্যাবেক প্রদেশের সীমানা অতিক্রম করে আমরা ক্যানেডার অণ্টারিও প্রদেশে প্রবেশ করলাম। সেণ্ট লরেন্স নদীর প্রবাহ এখনো আমাদের পাশ ছাড়ে নি ; জমির বন্ধুরতা কমে গিয়ে ক্ষেতখামারের দৃশ্য বেশী দেখা যাচ্ছে। জমি প্রায় সমতল ;—সামান্য ঢেউ খেলান, বনের প্রাচুর্য্য কমে এসেছে,—কর্ষিতক্ষেত আর তত বিরল নয়। নদী এখন ধীরে ধীরে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে ;—কখনো গাছপালা গ্রাম গঞ্জের আড়ালে,—কোথাও বা নয়ন গোচর। গৈরিক পশ্চিমাকাশে অস্তগামী রবির বিদায় লগ্নের ছবি।

আজ প্রায় ৫০০ মাইল গাড়ী চালিয়ে আমরা কর্ণোয়ালের মোটেলে এসে পৌছালাম। অতঃপর তৎপরতার সঙ্গে গাড়ী থেকে মাল টাল নামিয়ে নেওয়া হল। তারপর ক্ষণিক বিশ্রাম, চা পান, পথের জন্য খাদ্য পানীয় ক্রয়, রান্না বান্না ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলি শেষ করে খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে রাত দশটা বেজে গেল।

আজ পিণ্টু একটানা ৫০০ মাইল গাড়ী চালিয়েছে ; পরিশ্রম হয়েছে খুবই। সুতরাং মিতা ও জামাতাকে শয্যাগ্রহণের জন্য তাগাদা দিয়ে নিজেরাও কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম।

আজ সেণ্ট লরেন্সের কী স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যই না দেখলাম আর সাইক্লো-রামা' তে কী অপূর্ব অভিজ্ঞতাই না হল। সে সব কথা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

[কর্ণোয়াল—সহস্রদ্বীপ (Thousanb Islands)
টরেণ্টোতে পিতৃদিবস পালন]

টরেণ্টো, ক্যানেডা

পরদিন প্রত্যূষে চা টা খেয়ে একটু বাইরে পায়চারি করে ঘরে ফিরে দেখি মাতা ও কন্যা মিলে ততক্ষণে সিদ্ধ ভাত রেঁধে নিয়েছেন : কালকের রান্নার অবশিষ্ট যা ফ্রিজে রাখা ছিল তাও গরম করা শেষ। দেখে বল্লাম "সাধু! সাধু! গৃহিণীপণা—তা গৃহে হোক আর পথেই হোক—সদাই সমান সক্রিয়। পথের কেনা খাবারের একঘেয়েমি এবং ট্যাঁকের টাকা খরচ—এক ঢিলে দুটো পাখীকেই ঘায়েল করেছ দেখছি। সাধুবাদ দিতেই হয়। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে' এহেন কবির উক্তিটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ছাড়লে।"—এই না বলে দ্রুত স্নানাগারে ঢুকে পড়লাম ; সবাইকে দেরী করিয়ে দেওয়ার অপবাদ বার বার আর নিই কেন।

যাক্ গে—খাওয়া দাওয়া শেষ করে, গাড়ীতে বাক্স পেটারা তুলে সবাই মিলে গাড়ীতে বস্তে বসতে সেই ৯।। টা।

আজ আমরা ৪০১ নম্বরের রাজপথ পরিত্যাগ করে দু'নম্বরের রাজপথ ধরে যাব। তাতে সেণ্ট লরেন্স নদীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়বে। বিখ্যাত 'সহস্রদ্বীপ'ও নাকি এই পথেই পড়ে।

'সহস্র দ্বীপ' ব্যাপার টা আসলে কি খুলেই বলা যাক। সাগর সঙ্গম খুব বেশী দূরে নয় বলে সেণ্ট লরেন্স নদী এখানে শান্ত ও শ্লথগতি বিশিষ্ট। এ জায়গাটাতে নদীর বুকে বহু ছোট বড় দ্বীপ রয়েছে। তাদের এক একটা হয়ত মস্ত বড় একটি গ্রামের মত ; আবার ক্ষুদ্রতম দ্বীপটিতে হয়ত আছে একটি বড় পাথরের চাঁই, তার পাশে একটি

ছোট্ট কাঠের বাড়ী নিসঙ্গ একটা পাইন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে জলের আয়নায় মুখ দেখছে। এখানটায় নদীর বুকে এক গুচ্ছ দ্বীপপুঞ্জ, তাই স্থানীয় অধিবাসীরা আদর করে নাম রেখেছেন 'সহস্রদ্বীপ', এটা অত্যুক্তি নামক অলঙ্কারের প্রয়োগ মাত্র। গুণে গুণে নাম রাখার মত গুণবান কেউ নাম রাখেন নি বলেই আমার বিশ্বাস।

এই সহস্রদ্বীপের একটাতে বিবেকানন্দ তাঁর আমেরিকান শিষ্যদের সঙ্গে কিছুদিন নির্জনে ধ্যানধারণা পঠন-পাঠন করেছিলেন। একদিন এক প্রাচীন ওক গাছের নীচে বসে ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

যাক গে—আপাততঃ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ছেড়ে নয়নানন্দ প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক।

মাছধরার শখ যাদের রয়েছে—তারা এখানে মৎস্যশিকারের সুযোগ সহজে হারাতে চাইবেন না। তবে পিণ্টুর পক্ষে এ যাত্রা আর তা সম্ভব নয়। দৌহিত্রটি নিতান্তই শিশু। এত দীর্ঘ সফরে সে বিরক্ত হয়ে উঠবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি। তার উপর কাল রাত্রে মোটেলে দুরন্তপনা করতে করতে হাতে চোট লেগেছে। আজ সে কিছুতেই গাড়ী চড়তে চাইছে না। কিছুক্ষণ পরে পরেই 'নামি' 'নামি' বলে কাঁদছে। সুতরাং কিছুক্ষণ পরপরই গাড়ী থামিয়ে তাকে কিছুটা হাঁটা-চলা করিয়ে শান্ত করতে হচ্ছে।

আজ আমরা খুব সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলেছি। নদী এখানে খুব প্রশস্ত এবং শ্লথগতি, বুকে অসংখ্য দ্বীপ। আমাদের পথ নদীর তীর ঘেঁষে যাচ্ছে তীরে সর্বত্রই যেন উৎসবের মেজাজ। কোথাও মেয়েরা ঘোড়া চড়া শিখছে, কেউ ঘোড়া ছোটাচ্ছে, কোথাও বা মাছ ধরার রাজকীয় ব্যবস্থা, তার 'রজকীয় ব্যবস্থা' এখানে অনুপস্থিত। আমাদের মত জল পেলেই যত্রতত্র ধোপার পাট ফেলে কাপড় আছড়ানর রেওয়াজ এখানে নেই।

নৌকায় ও লঞ্চে বহু মৎস্যবিলাসী নদীবক্ষে ভাসমান; বিভিন্ন

বর্ণের পাল তুলে কত নৌকা নদী বক্ষে ভ্রমণবিলাসীদের বুকে নিয়ে জলবিহার করছে। মন্দস্রোতা অলসগামিনী এই নদীর তীরে তীরে লম্বা লম্বা জলজ ঘাস—যেমনটা আমাদের দেশের বিলের ধারে হয়ে থাকে। নদী এখানে এত চওড়া আর স্বল্পস্রোতা যে একে নদী না বলে বিল বললে খুব ভুল হবে না হয়ত। বুকে অসংখ্য দ্বীপ,—কোনোটা বা একটি মাত্র পাইন গাছ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা বা একটু বড় ;—তাতে কয়েকটা গাছ পালা, দু'একটি কাঠের বাড়ী, টিলার সানুদেশ নদীর জলে এসে মিশেছে, সেখানে দু'একটি নৌকা নোঙর করা। কোনো কোনো দ্বীপ যেন আস্ত একটি গ্রাম। তাতে গাছ-পালায় সবুজ পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ; পাহাড়ের গায়ে গায়ে মাথায় ও জলের ধারে ধারে নানা রঙের কাঠের বাড়ী, বহু নৌকা পাল গুটিয়ে অপেক্ষমান ; জলের বুকে অসংখ্য মোটর-চালিত নৌকা পাল-তোলা নৌকা রাজহাঁসের মত জলবিহার করে বেড়াচ্ছে। কিছু লম্বা লম্বা নৌকাতে ২/৪ জন আরোহী মাছ ধরায় ব্যস্ত। বহুদূরে নদীর পরপারে নীলাভ বৃক্ষশ্রেণীর ক্ষীণ রেখা। এ পাড়ে কিছু দূরে দূরেই ক্লাব ঘরের ভিড়। সেখানে বহু মোটর দাঁড়িয়ে,—তীরে অনেক নৌকা বাঁধা।

ভ্রমণবিলাসী ও আনন্দ অনুসন্ধানীদের স্বর্গ এই সহস্রদ্বীপ। অনেক প্রাচুর্য্য এদের আছে বলে এমন চুটিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করার এত তাড়া। সঙ্গে রয়েছে অবচেতন মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার —'yon have only one life to live'। জীবন একটা বৈ ত নয়। সময় থাকতে তাই জীবনটাকে চুটিয়ে ভোগ করে নাও—এটাই যেন এদের জীবন দর্শন।

যতই এদেশ দেখছি ততই মনে পড়ছে—আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কথা। এত জনসংখ্যা, এত দারিদ্র্য, শিক্ষাদীক্ষা দূরে থাক—মোটাভাত মোটা কাপড়ের চাহিদা মেটাতে আশৈশব পণ্ডশ্রম করতে করতে একদিন মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি। আর এদের ? প্রচুর জমি,—

তুলনায় লোকসংখ্যা যৎসামান্য, প্রচুর কর্মের সংস্থান, প্রচুর অর্থ, প্রায় প্রতি বাড়ীতেই একটি করে মোটর গাড়ী।

কাজে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্রয় পায় না বলে সপ্তাহে পাঁচদিন প্রাণপণে খাটে, বিনিময়ে চুটিয়ে রোজগার করে। কাজ—তা সে যাই হোক না কেন—সাধারণ ভাবে জীবন যাপনের উপযোগী অর্থ সবাই পেয়ে থাকে, আর তেমনি জীবনটাকে চুটিয়ে ভোগ করে নেয়। ওদের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু বলতে চাই—'ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক'—কাজে ফাঁকি তারা দেয় না এবং বিনি কাজে 'পাইয়ে দেবার' মন্ত্র দেবার লোকও এখানে খুব পাত্তা পায় না। প্রচুর কাজ,—তবে কাজ পাওয়া যত সহজ কাজ চলে যাওয়া তার চাইতেও সহজ। প্রকৃতির অকৃপণ দানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিরলস কর্ম এবং তাতে সোনায় সোহাগা সীমিত জনসংখ্যা। আশ্চর্য্য কি এদেশের অতিসামান্য লোকদের জীবনের মান আমাদের দেশের মধ্যবিত্তদের থেকে অনেক উঁচু!

যাক গে—ও সব কথা বলার অধিকার আমার নেই; যে বেদনা বোধ করতে পারব না, তাকে ভুলে থাকাই ভাল!

আপাততঃ অশান্ত হৃদয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রশান্ত সেন্ট লরেন্স নদীর বুকে সহস্রদ্বীপের সহস্র সহর্ষ দৃশ্যাবলীতেই ফিরে যাই।

বিস্তৃত সেন্ট লরেন্স নদীর বুকে অসংখ্য সবুজ সবুজ দ্বীপ, যেন আমাদের দেশের নদীর বুকে ছোট ছোট প্রদীপ ভাসানোর মত; সবুজ দ্বীপ নয়—যেন সবুজ শীর্ষ দীপশিখা পাইন বনের শীর্ষে শীর্ষে। মাঝে মাঝেই গাড়ী থামিয়ে দৌহিত্রটিকে একটু হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং কিছু খাওয়ান হচ্ছে।

আমেরিকার মত ক্যানেডার খাবার দোকানের ব্যবস্থাও অতি-পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত তদারকীর ফলে গাফিলতি করার উপায় নেই;—একটু নোংরা দেখলেই দোকানদারের অনুমতিপত্র তৎক্ষণাৎ বাতিল।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর 'কেটারা গুই' নদী পার হলাম। বাম পাশে এখনও সেন্টলরেন্স নদী তার সমুদ্রসদৃশ বিস্তৃতি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। জমি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নদীতে এসে মিশেছে; ডানদিকের উঁচু পাহাড়ের গায়ে দু'একটি সাদা বা লাল রংএর বাড়ী। নদী একটু একটু করে দূরে সরতে সরতে এক সময় সত্যই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল:—কারণ আমরা যে দুই নম্বর ছেড়ে আবার ৪০১ নম্বর রাজপথ ধরে চলতে শুরু করেছি। 'বিদায় সেন্টলরেন্স!' মনে মনে বল্লাম—"অনেক কিছু পেলাম তোমার কাছে; ভুলব না তোমাকে।"

এখন আবার পুরাতন ৪০১ নম্বরের রাজসরণীর স্মরণ নিয়েছি। দু'পাশের আন্দোলিত প্রান্তরে শস্যক্ষেত্র;—কোথাও পুষ্পিত তৃণভূমি,—কোথাও বা বার্চ্চ সিডার পাইনের বন। দুপুর কখন গড়িয়ে গেছে।

'বেল্লেভিলে' পেরিয়ে আমরা ট্রেনটনের কাছে এসে একটা ছোট নদী পার হলাম। ব্রাইটনের কাছে এসে bright অনুভব করলাম,—মনে হল যেন গন্তব্যস্থান আর বেশী দূরে নয়! এখানকার ভূ-প্রকৃতি প্রায় সমতল। তৃণময় প্রান্তরের মধ্যে কোথাও কোথাও বনবৃক্ষের সারি;—তার ফাঁক দিয়ে দু'একটা কাঠের বাড়ী ছবির মত দেখ'চ্ছে। কোথাও বা দু'চারটা হৃষ্টপুষ্ট গরু চরছে। গাড়ী 'নিউক্যাসল' পার হয়ে গেল। এবার আমাদের পথের একদিকে হ্রদ আর একদিকে সমতল হরিৎ ক্ষেত্র। 'বাউমেন ফিলে', 'ওসাওয়া', 'হুইটলে' প্রভৃতি জনপদ পর-পর পেরিয়ে গেলাম। আকাশ আঁধার করে বৃষ্টি নামল:—তবে গাড়ীর জানালা দিয়ে দেখতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না! এটাত আর আমাদের মত মৌসুমী-বায়ু বাহিত বৃষ্টির দেশ নয়;—ঘনবর্ষণ কদাচ হয়।

ক্রমেই উড়াল পুল ও রাস্তার পাশে ঘর বাড়ীর সংখ্যার বৃদ্ধি দেখে মনে হচ্ছে টরেন্টো তুরন্ত পৌঁছে যাব। ঘনায়মান সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে বর্ষণসিক্ত ঝাপসা হয়ে আসা মাঠ ঘাট সৌধ অট্টালিকা দেখতে

দেখতে কনিষ্ঠ শ্যালক নীলাদ্রি ওরফে চাঁদুর বাড়ী যাচ্ছি আমরা। রাস্তার নির্দেশ দেওয়া-চিঠি দেখে দেখে গাড়ী চালাতে হচ্ছে; মনে হচ্ছে যেন সারা টরেন্টো শহরটাকেই পার হয়ে এলাম। হঠাৎ ডান দিকে মোড় ফেরার পরই মনে হল আমরা এবার শহরতলি এলাকায় চলে এসেছি। ঝির ঝির বৃষ্টি মাথায় করে এ রাস্তা সে রাস্তা করতে করতে গাড়ী শেষটায় চাঁদুর বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে তখন:—কন্যা ছুটিকে নিয়ে চাঁদু ও রাণু দোর ধরে আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

আজ প্রায় ৪৫০ মাইল মোটর ভ্রমণের পর চাঁদুদের দোর গোড়ায় এসে আমাদের দীর্ঘভ্রমণের প্রথম পর্ব শেষ হল—শ্রীমার অসীম কৃপায়।

ছুটি কোলে ছুটে এসে চাঁদু তার দিদিকে হাসি মুখে বলল "তাহলে দিদি! সত্যি তোমার ক্যানেডায় আসা হল! এতো কল্পনা ও করা যায় নি কখনো! কী যে আনন্দ হচ্ছে!" সুস্মিতাননা রাণু এসে সাদর সম্ভাষণ জানাল.

সবাই এক সঙ্গে হাত লাগিয়ে মালপত্রগুলির একটা হিল্লে করে এনেছি—হেনকালে সকন্যা সস্বামী ছোটশালী মঞ্জুর আবির্ভাব।

সাত সমুদ্র তের নদী পারের প্রবাসী কনিষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে সকন্যা সস্বামী, সজামাতা, সদৌহিত্র দুই ভগ্নীর একসঙ্গে আগমন এতই অপ্রত্যাশিত আনন্দের যে সে সম্মিলিত আনন্দ কোলাহল নায়েগ্রা গর্জনকেও বুঝি হার মানাল।

যথাকালে হৈ চৈ একটু স্তিমিত হয়ে আসলে স্নানাদি সমাপনের পর মনে হল যেন দীর্ঘভ্রমণের ক্লান্তি কিছুটা কেটেছে। জমিয়ে আড্ডা-দেবার প্রতীক্ষায় রয়েছি—হেনকালে রাণু এসে তাড়া দিতে লাগল যেন ধুতি পাঞ্জাবী পরে পুরো বাঙ্গালী সেজে অবিলম্বে নীচে নেমে আসি। বল্লাম—"বুঝলাম,—কিন্তু এত তাড়া কিসের?" উত্তরে জানাল—পিতৃদিবস (Father's day) নামক সদ্যপ্রচলিত পর্বটি নাকি পিতৃ-চতুষ্টয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

এদেশে মা'র প্রতি শ্রদ্ধার কমতি নেই, যদিও বাপের বেলায় ঠিক উল্টো,—যেন 'উল্টোপরশুরাম'। মাতৃভক্তির জন্যই হয়ত এদেশের এত উন্নতি;—অধুনা শুনছি—'পিতৃদিবস' পালন করার 'রেয়াজ'ও সম্প্রতি 'চালু' হয়েছে! আজ এখানে চার পিতা উপস্থিত; চাঁদু, পার্বতী, পিন্টু ও আমি;—আজ আবার এখানকার 'পিতৃদিবস'। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়!

টেবিলে হরেক রকমের দেশী খাবার—সন্দেশ, চমচম, রসগোল্লা, রসমালাই, সিঙ্গারা, নিমকি—আর ও কত কি! সবই রাণুর নিজের হাতে তৈরী। এখানে বাংলাদেশের মিষ্টি পাওয়া যায়না বলে—আমাদের মেয়েরা নিজেরাই মিষ্টি তৈরী করা শিখে নেয়; অসুবিধার কিছুই নেই,—দুধ চিনি ত সস্তা এবং অঢেল পাওয়া যায়।

খাবার ছাড়া টেবিলে রয়েছে চারখানা কার্ড চারটি আলাদা আলাদা খামে ভর্ত্তি চার পিতার জন্য রঞ্জার সযত্ন নির্বাচিত।

অনেক আনন্দ, হৈ চৈ হাসি ঠাট্টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ হল এবং সকলের শেষে মহাসমারোহে ছবি তোলা হল।

কন্যাদ্বয়ের সহসা মনে পড়ল—বিদেশে সবাই মিলে এই যে আনন্দোৎসব করা হল—সে খবরটা সাত সাগরের পারে রয়েছেন যে ৮৮ বৎসরের বৃদ্ধা জননী—তাঁকে জানালে হয় না? তৎক্ষণাৎ চিঠি-লেখা হয়ে গেল এই বলে যে সপ্তসমুদ্রের পারে বসে তোমার অধস্তন তিন পুরুষ আজ তোমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। নীচে স্বাক্ষর রইল—দুই জামাতার, দুই কন্যার, দুই নাতিনীর, কন্যার জামাতার এবং টিপসই রইল দুইবৎসরের দৌহিত্রী সুতেরও পৌত্রীর।

আহারান্তে বিশ্রাম—যার জন্য ক্লান্ত দেহ তার ন্যায্য দাবী বহুক্ষণ ধরে নীরবে জানাচ্ছিল।

পরদিন কাটল কিছু না করে; কিছুটা আড্ডায় ও কিছুটা পড়াশুনায়। চাঁদুর বাড়ীতে প্রতি ঘরে ঘরে প্রচুর বইএর সংগ্রহ—বাংলা, ইংরেজী ও জার্মান ভাষার। খুঁজতে খুঁজতে তুলট কাগজে লেখা

অন্ততঃ দু'তিন শ বছরের পুরণো একখানা গীতা পেয়ে গেলাম। বইএ মুখ গুঁজে বেশ কিছুটা সময় সে দিন কাটল; পরদিনও তাই। তবে মাঝখানে একটু গানবাজনার আসরও বসেছিল।

টরেন্টোতে এক মার্গসঙ্গীত পারদর্শিনী ভদ্রমহিলা থাকেন। আগের দিন বিকেলে চা খেতে খেতে রেকর্ডে তাঁর খানকয়েক ভজন ও দ্রুতলয়ের খেয়াল শুনেছিলাম। বিদেশে এসে গান প্রায় ছেড়েও দিয়েছিলেন। টরেন্টোর এক দুর্গাপূজার আসরে তাঁর গান শুনে চাঁদু ও তার বন্ধুরা তাঁর পেছনে ক্রমাগত লেগে থেকে তাঁকে আবার সঙ্গীতের জগতে ফিরিয়ে এনেছেন। ভদ্রমহিলা এখন ওখানে গায়িকা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিতা; রেকর্ড করেছেন এবং একটা গানের স্কুলও চালাচ্ছেন। তাঁর রেকর্ড শুনে আমার মনে হয়েছিল ঐ নামের এক ভদ্রমহিলার গান বছর ১৫/১৬ আগে কোলকাতার বেতারে শুনেছি। পরে জানলাম —আমার অনুমান ঠিকই,—ইনিই সেই মহিলা।

ভদ্রমহিলাকে মঞ্জুরা পরদিন দুপুরে হারমোনিয়াম সমেত এই বাড়ীতে এনে হাজির করল। দুপুরে খাওয়ার পর উপরের ঘরে একটু বিশ্রাম করছি—এমন সময় খবর এল—'নীচে গানের আসর বসেছে, চলে আসুন তাড়াতাড়ি'। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর গানের আসর! এটা ত গানের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। যা হোক্ নীচে নেমে এসে গানের আসরে এসে বসা গেল।

ভদ্রমহিলা একটা দ্রুত খেয়াল দিয়ে শুরু করে পরে ৩/৪ টি সুন্দর ভজন পরিবেশন করে তাঁর গান শেষ করলেন।

বেশ গমক রয়েছে গলায়—যা মেয়েদের গলায় প্রায় শোনাই যায় না।

এবার ডাক পড়ল আমার। হকচকিয়ে গেলাম কিছুটা। আসরে গাইতে হলে তার জন্য প্রস্তুতি চাই কিছুটা। আমার প্রস্তুতি কোথায়! রেয়াজ ছেড়েছিও বহুদিন হল। মঞ্জুরা হয়ত তাদের বোন ও ভগ্নীপতি সম্বন্ধে একটু সালঙ্কারেই বলে থাকবে। সে ত হল—এখন আমি

সামলাই কি করে! অপ্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে শ্রীমাকে স্মরণ করে কয়েকটি রাগাশ্রয়ী মীরার ভজন পরিবেশন করা গেল। পরমাশ্চর্য্য —অমানীকে মানদাত্রী শ্রীমা সে দিন চাঁদু ও মঞ্জুর মুখ রক্ষা করেছিলেন।

মহা উৎসাহে ভদ্রমহিলা ত পরদিন তাঁর বাড়ীতে গান গাইবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। বাপ! আর এপথে পা বাড়াই কখনো!—সময়-অভাবের অজুহাত দেখিয়ে কোনমতে বেঁচে গেলাম।



[টরেণ্টো-অণ্টারিও হ্রদ-ক্যানেডিয়ান ন্যাশানেল টাওয়ার]

টরেণ্টো, ক্যানেডা।

সকালে মঞ্জু পার্বতীরা সকন্যা নিউইয়র্ক ফিরে গেল। এবার শুরু হল চাঁদুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমাদের টরেণ্টো পরিক্রমা।

বিকেলে চাঁদুর সঙ্গে টরেণ্টোর সুবিখ্যাত ক্যানেডিয়ান ন্যাশানেল কর্তৃক নির্মিত স্তম্ভ সংক্ষেপে সি. এন্ টাওয়ার দেখতে যাওয়া হল। এটাই নাকি পৃথিবীর উচ্চতম স্তম্ভ; প্যারিসের ইফেল টাওয়ারকেও উচ্চতায় 'ফেল' করিয়েছে। এঁরা দাবী করেন এই স্তম্ভ 'উচ্চতায় ১৮১৫ ফিট, মালমশলার ওজন নাকি ২৩,২১৪ টা বিরাট হাতির ওজনের সমান। এখানকার নিয়মিত কর্মীর সংখ্যাই নাকি ৪৫০। বৎসরে ১৮ লক্ষেরও বেশী লোক এটা দেখতে আসেন। এর উপরে উঠতে গেলে তোমাকে ২৫৭০ টা সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে। তবে ভয়ের কারণ নেই, উপরে উঠবার জন্য লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেটা খুবই ভাল ;—আমাদের দেশের 'শাত্তন বেলা গোলা'র মন্দির ত নয় যে যেতে হলে ৬/৭শ খাড়া খাড়া সিঁড়ি ভাঙ্গতেই হবে।

টাওয়ারের একদিকটাতে দিগন্ত প্রসারী অণ্টারিও হ্রদ, অন্য দিকে সুবৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশান। রেলের উড়ালপুলের উপর দিয়ে গিয়ে তবে টাওয়ারের নীচের একতলা বাঁধান বেদীতে (Plaza) ঢুকতে হয়।

ওখানে পৌছে টিকিট কেনা হলে আমরা চাঁদুর সঙ্গে (Elevator) এলিভেটারে উঠলাম। এলিভেটার আমাদের সিধে স্কাইপড ইনডোর-অবজারভেশান লেভেল (Skyped Indoor obzervation level) এ পৌছে দিল। এর ভেতরে ৪টা ভিন্ন ভিন্ন শুনবার বিভাগ (listening Zone) রয়েছে। ওখানে ওয়াণ্ড (Wand) অর্থাৎ টেলিফোনের মত

একটা যন্ত্র কানে লাগালে ৪টা আলাদা আলাদা বিভাগে কি কি দ্রষ্টব্য রয়েছে তার বর্ণনা, ইতিহাস ইত্যাদি শুনতে পাওয়া যায়। ইংরেজী ও ফরাসী উভয় ভাষাতেই এই বক্তৃতা বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে।

১নং বিভাগে রয়েছে এই শহরের বিশিষ্ট এলাকা :—সেখানে বিশাল বিশাল বহুতল বিশিষ্ট সৌধ, প্রসিদ্ধ অফিস হোটেল প্রভৃতির অবস্থান। উপর থেকে দেখলে মনে হয় বুঝি খেলার বাড়ীঘর,—দেশলাই এর বাক্স দিয়ে তৈরী। শহর আদিগন্ত বিস্তৃত। সন্ধ্যার পর শহরে আলো জ্বলে উঠলে মনে হয়—শহরে যেন দীপান্বিতা উৎসব চলেছে।

২নং বিভাগে গগনচুম্বী অট্টালিকারা অনুপস্থিত :—শহরের এই মধ্যবিত্ত অঞ্চলের এই দিগন্তপ্রসারী ইষ্টকারণ্যকে রাত্রের আলোর বন্যায় প্রসাধিতা নাগরীর মত লাগছিল।

৩ নম্বর বিভাগে রয়েছে বন্দর, ডকইয়ার্ড, আর ভ্রমণ বিলাসাদের নোঙর করা অসংখ্য পালের নৌকা। দূরে হ্রদের এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটা ঘরোয়া ছোট বিমান বন্দর ; তাতে অন্ততঃ ৫০/৬০ খানা এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমান দাঁড়িয়ে আছে ; কয়েকটি আকাশে উড়বার জন্য রানওয়েতে দৌড়াচ্ছে, কয়েকখানা নামবার উপক্রম করছে আর বেশ কয়েকটি হ্রদের উপরে সামুদ্রিক পক্ষীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। এগুলি নাকি এখানকার ধনী ব্যবসায়ী বা খামারের মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সৌখিন আকাশ-ভ্রমণে এদের অপরিসীম আগ্রহ। দূরে দেখা যাচ্ছে--অন্টারিও হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলরাশির আদিগন্ত বিস্তার পড়ন্ত রৌদ্রে ঝলমল করছে। আর এক দিকটাতে টরেন্টো রেলষ্টেশানের সর্পিল রেল লাইনের অগণিত রেখা, আর তাতে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত রেলের বগি।

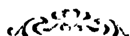
৪ নম্বর বিভাগে রয়েছে ২ নম্বর ও ৩ নম্বরের সহাবস্থান ; কিছুটা অট্টালিকা কন্টকিত নগরী, কিছুটা অন্টারিও হ্রদ ও তার আশপাশের শহরেরর হাট বাজার, দোকানপাট সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এলাকা বা ডাউন টাউন অঞ্চল।

এসব দৃশ্য 'আউটডোর অবজারভেশান লেভেল' থেকে আরও ভাল দেখা যায় বলে আমরা অতঃপর সেখানেই গেলাম।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি তার উপরেও বেশ কয়েকটি তলা রয়েছে। আমাদের ঠিক উপরে রয়েছে "স্পার্কলস্ ক্লাব"—গদা মেরে না হোক কান মুচড়িয়ে বিলাসীদের কাছ থেকে অর্থ নিংড়ে নেবার যন্ত্র বিশেষ। তার উপরের তলায় রয়েছে ঘূর্ণমান ভোজনালয়;—এটাই নাকি পৃথিবীর উচ্চতম ঘূর্ণমান ভোজনালয়। ভোজনালয়ের ছ'টি বিশেষণই সার্থক, উচ্চতায়ও বটে আবার ভোজ্যদ্রব্যের দাম শুনলে মাথাও ঘুরে যায়। উচ্চতম না হলেও সুউচ্চ স্থানু ভোজনালয় আমাদের বেঙ্গালোরে ছিল। শুনেছি সেটা নাকি ভেঙ্গে গেছে। বোম্বেতেও একটি বেশ উঁচু ঘূর্ণমান ভোজনালয় রয়েছে. তবে উচ্চতায় এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর উপরের তলায় রয়েছে বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি প্রেরণের যন্ত্রপাতি এবং তারও উপরে রয়েছে 'স্পেসডেক', সেটা আবার সর্ব সাধারণের পক্ষে অগম্য। স্তম্ভ শীর্ষ ত আরও উঁচুতে, মাটি থেকে ১৮১৫ ফিট উর্দ্ধে।

যাক—আলোকমালায় সজ্জিতা টরেন্টো নগরীর অসামান্য রূপ উর্দ্ধলোক থেকে দর্শনান্তে ভূপৃষ্ঠের জীব যথাস্থানে ফিরে এলাম।

যথাসময়ে চাঁছুর গাড়ীতে চড়ে তার বাড়ীতে ফিরে এলাম সবাই। অতঃপর কিঞ্চিৎ আলাপ আলোচনা, কাল বিকেলে নায়েগ্রা দর্শনের কর্মসূচী ঠিক করা, নৈশাহার, ইত্যাদি শেষ হলে এক সময় কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম। আজ ত নাসিকা গর্জ্জনের পালা শেষ হোক, নায়েগ্রা গর্জ্জন শোনা কালের জন্য তোলা থাক।



[নায়েগ্রা প্রপাত দর্শন]

টরেণ্টো, ক্যানেডা

আজ ঘুম ভেঙ্গেই মনে হল—আজ বিকেলে চাঁদু আমাদের বিখ্যাত নায়েগ্রা প্রপাত দেখিয়ে আনবে।

চাঁদু একটু সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরল সে দিন। বিকেলে তিনটা নাগাদ আমাদের নায়েগ্রা অভিসার শুরু হল;—সঙ্গে রাণু বিস্তর ভোজ্য পানীয় দিয়ে দিল। গাড়ী শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে;—রাস্তায় বেজায় ভিড়,—ঘণ্টা খানেক লেগে গেল 'ট্র্যাফিক্ জ্যাম' এর নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে। রাস্তার দু'পাশে স্তব্ধীভূত সবুজ সমুদ্রের ঢেউ। কোথাও বা শ্যাম শস্যক্ষেত্র, কোথাও বা তৃণময় প্রান্তর, গাছপালা ছবির মত সুন্দর বাড়ী ঘর। পৃথিবীর একটা বিশিষ্ট অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে যাচ্ছি; তাই সবার মনে একটা চাপা উত্তেজনা।

চলন্ত গাড়ী থেকে রাস্তার নামটা এক ঝলকে দেখে নিয়ে কনিষ্ঠ শ্যালককে বল্লাম—"ওহে চাঁদু! বরাবর ত রাজপথই তোমার পছন্দ; হঠাৎ রাণীর প্রতি টান কেন?" চাঁদু বল্ল—"তার মানে?" উত্তরে বল্লাম—"পড়েই দেখনা রাস্তার নামটা; এটা কি কুইন এলিজাবেথ-ওয়ে নয়?" হেসে চাঁদু বল্ল—"উপায় নেই, হয় রাণী নয় দুয়রাণি; অন্য পথে গেলে অনেক ঘুরপথ।"

আমাদের রাস্তা অণ্টারিও হ্রদের পাশ দিয়ে সিধে নায়েগ্রা জলপ্রপ্রাতের কাছে পৌঁছে যাবে। প্রকৃতির শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে যাচ্ছি;—কর্মপৃষ্ঠবৎ গড়ান তৃণময় হরিৎ প্রান্তর, বার্চ্চ, মেপল, ওক, পাইন প্রভৃতি গাছের আড়ালে নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর

ঘরবাড়ী, ঝকঝকে রাস্তার ছ'পাশের সবুজ ঘাসে নানা রঙ্গের বন-কুসুম,—আকাশের ঘন নীলে সাদা মেঘের আলপনা।

একটু পরেই একটা একটানা সহস্রমেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনি কানে এল। চাঁছ বল্ল—"এটাই নায়েগ্রার গর্জ্জন।" নায়েগ্রা তাহলে সত্যই ভীম-গর্জ্জনা। দেখতে দেখতে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর চাঁছ একটা ভাল জায়গা দেখে গাড়ী দাঁড় করাল। কী সুন্দর জায়গা! একদিকে পাহাড়ের গায়ে চিরহরিৎ পাইনের বন; তার ঠিক নীচেই জমি ঢালু হতে হতে রাস্তায় এসে মিশেছে। রাস্তার ও পাশেই নায়েগ্রা প্রপাত,—মাঝখানে একটা বাড়ীর ব্যবধান মাত্র। এই সুন্দর জায়গাটা একটা ছোট খাট পার্কই বটে। ঢালু সবুজ মাঠে ২/১ টা পাইন, মাঝে মাঝে বসবার জন্য কাঠের টেবিল ও বেঞ্চ আস্ত গাছের কাণ্ড চিরে তৈরী, ৩০/৪০ গজ অন্তর নোংরা ফেলার জন্য ঢাকনা দেওয়া ড্রাম। হাত মুখ ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চা টা খেয়ে সবাই চাঙ্গা হয়ে নিলাম! তারপর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে আমরা চাঁছর পেছনে পেছনে চল্লাম।

দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি উর্ম্মিমালা উত্থিত শিকর নিকর মেঘের মত উপরে উঠে যাচ্ছে,—আর কখনো বা হাওয়ায় ভেসে এসে আমাদের কিঞ্চিৎ সিক্ত করে দিচ্ছে। জলপ্রপাতের কাছে গিয়ে দেখলাম—একটা বিরাট নদীর আত্মহত্যা;—সহসা সমতল ছেড়ে অকস্মাৎ ১৬০ ফিট নীচের গভীর খাদে মরণ-ঝাঁপ দিচ্ছে, চূর্ণীভূত জলধারা উত্থিত জলকণা মেঘের মত উপরে উঠছে, তার উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে এক বিরাট সাতরঙ্গা রামধনু প্রপাতের এপাশ থেকে ওপাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কী অপূর্ব! বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবার মত দৃশ্যই বটে। সাধে কি আর এখানে সারা পৃথিবী উজাড় করে দর্শনার্থীরা এসে ভিড় জমায়!

নায়েগ্রার আবার 'হিন্দুস্থান' 'পাকিস্তান' আছে। একটা অংশ আমেরিকায়,—সেটা ছোট; আর বড় অংশটা ক্যানেডায়। একমাত্র ক্যানেডার নায়েগ্রা দেখতেই বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক নাকি

আসে। আর ফটো তোলার হিড়িকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কোডাক ফিল্মের বিক্রী হয় এখানেই।

নায়েগ্রা প্রপাতের দুই অংশের কথাটা একটু বিশদভাবে বলছি। যে অংশটা আমেরিকার ভাগে পড়েছে সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট; আর ঘোড়ার খুরের আকার বিশিষ্ট মুখ্য অংশটা পড়েছে ক্যানেডাতে। এই দুই অংশের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।

আমেরিকা আর ক্যানেডার মধ্যে রয়েছে পাঁচটি সাগর সদৃশ মিষ্টি-জলের বিরাট বিরাট হ্রদ। তারা পরস্পরের সঙ্গে ছোট ছোট প্রণালী দিয়ে যুক্ত!

লেক সুপিরিয়র আর লেক হিউরন মিশেছে স্যা স্যুঁ মেরী (saultst Mary)-র কাছে। হ্রদ দুটি আবার এক সমতলে নয়; তাই জাহাজ চলাচলের জন্য লক (Lock)-এর ব্যবস্থা রয়েছে। তার সামান্য দক্ষিণে লেক হিউরন একটা ছোট প্রণালী দিয়ে লেক মিশিগানে এসে মিশেছে। লেক হিউরনের জল আবার ডেট্রোয়েটের কাছে লেক ইরিতে পড়ছে। বাকী রইল লেক অন্টারিও। তার সমতল আবার লেক ইরির সমতল থেকে অনেকটা নীচে। একটা ৫৬ কিলোমিটার লম্বা প্রণালী দিয়ে লেক ইরির জল এসে পড়েছে অন্টারিও হ্রদে। এই প্রণালীটির নামই হল নায়েগ্রা নদী, ওরা বলে 'নায়গারা'। খুব ছোট নদী হলেও এটাই পৃথিবীর মধ্যে ক্ষিপ্রতম নদী, গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৮ কিলোমিটার। সামান্য ঢালু পাথুরে জমির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে যেতে যেতে এই ফেনশুভ্রা হাস্যময়ী চটুলা নদী হঠাৎ ১৭০ ফিট নীচে মরণঝাঁপ দিচ্ছে। এই মরণ ঝাঁপটাই হল নায়েগ্রা জলপ্রপাত।

প্রয়াগ না হলেও এই প্রপাতটি ত্রিবেণীই বটে। 'গোট দ্বীপ' গোটা নায়েগ্রা নদীকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছে। একটা গেছে আমেরিকায়; সেটিও আবার দ্বিধাবিভক্ত;—আর একটা অংশ গেছে ক্যানেডাতে। বলা বাহুল্য এই নদীর দুই তীরে দুই দেশ। আমেরিকার অংশটি দ্বিধা বিভক্ত হলেও চওড়াতে অনেক কম;—তাই চমকপ্রদ ও

অপেক্ষাকৃত কম ;—উচ্চতায় ১৭০ ফিট অর্থাৎ ক্যানেডার অংশটা থেকে উচ্চতায় ১০ ফিট বেশী, কিন্তু চওড়াতে মাত্র ১০০ ফিট। তার উপর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পাথরের ধ্বস পড়ে নীচের অংশে পাথরের চাঁই জমে থাকায় আমেরিকার অন্তর্গত নায়েগ্রার দর্শনীয়তার অনেক ক্ষতি হয়েছে।

ক্যানেডার নায়েগ্রা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত ; উচ্চতায় ১৬০ ফিট। দশ ফিট খাটো হলে কি হবে, চওড়ায় ২০০০ ফিট ; তাই চিত্তাকর্ষকও অনেক বেশী! তার নীলাভ সবুজ বিশাল জলধারা হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে ১৬০ ফিট নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক আশ্চর্য্য দৃশ্যের অবতারণা করেছে। বহু নিম্নের কঠিন শিলারাশিতে চূর্ণীভূত জলধারা উত্থিত জলকণার স্তানুকল্প মেঘ উর্দ্ধে ছড়িয়ে আছে। তাতে সূর্য্যকিরণ পড়ে যেন এপার থেকে ওপারে এক সপ্তবর্ণসমৃদ্ধ ইন্দ্রধনুর সেতু তৈরী হয়েছে। বাত্যাবিতাড়িত উর্দ্ধোত্থিত জলকণা কখনো কখনো ১৬০ ফিট উর্দ্ধে দণ্ডায়মান দর্শকবৃন্দকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। অস্তগামী সূর্য্যের আলোকে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখের সামনে প্রসারিত। বহু দর্শকের মত আমরাও বেশ কয়েকটি ছবি তুলে রাখলাম ; মনে ত রইলই, তবুও থাক না কাগজে মুদ্রিত হয়ে এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে ভবিষ্যতের জন্য।

আগেই বলেছি—রেড ইণ্ডিয়ানরা নায়েগ্রাকে বলে 'নায়গারা'। কেন জান? ওদের ভাষায় এর মানে সহস্র মেঘের গর্জ্জন ; এ প্রপাত সার্থকনামাই বটে!

সহস্রমেঘনাদী হলেও শীতকালে নায়েগ্রা একেবারে মূক—অফিসের জাঁদরেল বড়বাবু ঘরে এসে মুখরা স্ত্রীর কাছে যেমনটি। কারণ এখানকার তাপাঙ্ক তখন শূণ্য ডিগ্রির অনেক নীচে, সমস্ত জল প্রপাতটাই তখন জমে বরফ। ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে টুকিটাকি মেরামতের জন্য আবার সেটাই সুবর্ণ সুযোগ। কত সেতু, কত বাঁধ, কত কলকব্জা ইত্যাদি এখানে।

এখানে একরকম ট্রামের মত ছোট্ট গাড়ী আছে, পাহাড়ের খাড়া সানুদেশ বেয়ে যাত্রীদের পাহাড়ের উপরে নিয়ে যায়; সেখান থেকে প্রপাতটি দেখতে নাকি ভারী সুন্দর। আবার সুড়ঙ্গ কেটে পাহাড়ের ভিতরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও আছে সেখান থেকে পাটাতনে দাঁড়িয়ে দেখা যায়—নায়েগ্রার ধারা দুর্দ্দান্ত গতিতে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে —আর সফেন উর্ম্মিমালা উত্থিত জলকণা যেন মেঘ হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। সেখানে দাঁড়ালে ভিজে যাবার হাত থেকে বাঁচার জন্য বর্ষাতি পরে দেখতে হয়। আবার প্রপাতের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে দেখার জন্যও পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার এতেও যদি কেউ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হন, তবে তার জন্যও লঞ্চের ব্যবস্থা মজুদ। লঞ্চে চড়ে প্রপাতের ঠিক সামনে পর্য্যন্ত যাওয়া যায়; জলকণার মেঘে দৃষ্টি তখন ঝাপসা,—পায়ের তলায় জল যেন টগবগ করে ফুটছে, আর উৎক্ষিপ্ত জলকণায় মুখ চোখ বসনভূষণ সিক্ত। এর জন্য যে বিশেষ লঞ্চটি রয়েছে তার নামটাও কবিত্বপুর্ণ এবং মিষ্টি—"মেইড অফ দি মিষ্ট"। তবে এসবই বেশ ভাল রকম দক্ষিণার বিনিময়ে প্রাপ্য;— 'নাফা' কি করে উঠাতে হয়—এ বিদ্যায় এঁরা বিশ্বের বিস্ময়।

শীতকালে যখন নায়েগ্রা জমে যায়—তখন নাকি তার উপর নানা বর্ণের আলোকসম্পাত করে এক সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা হয়। সে দৃশ্য দেখার জন্য দুর্দ্দান্ত শীত তুচ্ছ করেও অগণিত লোকের ভিড় হয়।

বিখ্যাত নায়েগ্রা প্রপাত প্রাণ ভরে দেখলাম। কিরকম লাগল? তা হলে চার্লস্ ডিকেন্সের মুখ থেকেই সেটা শোনা যাক্। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:—

"It was not until I came to Table Rock and looked, Great Heaven. On what a fall of bright green water, that it came upon me in its full might and magesty······Niagara was atonce stamped on my heart."

অর্থাৎ—"টেবিল রকে এসে উজ্জ্বল সবুজ জলধারার এই জল প্রপাতটি চোখে পড়ার আগে—হায় ভগবান! আমার কি কোনো ধারণা ছিল যে এই প্রপাতটি কতটা শক্তিমত্তা আর রাজকীয় মহিমায় পূর্ণ।......সেই মুহূর্তেই নায়েগ্রা আমার হৃদয়ে চিরদিনের মত অঙ্কিত হয়ে রইল।"

সব কিছুরই শেষ আছে,—আমাদের নায়েগ্রা দেখাও শেষ হল এক সময়। বিশ্বের বিস্ময় নায়েগ্রা প্রপাত দেখার উদগ্র বাসনা আশৈশবের, এতদিনে সে কৌতূহলের নিবৃত্তি হল।

অনিচ্ছুক চরণে সবাই এসে গাড়ীতে বসলাম এবং যথাসময়ে আলোকোজ্জ্বল টরেন্টোনগরীতে প্রত্যাবর্তন করা হল।

কাল সকালে আবার দাঁদুর সঙ্গে এখানকার একটা বিশিষ্ট আর্ট-গ্যালারী দেখতে যাব। সেখানকার সংগ্রহশালায় স্থানীয় আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের নানা শিল্পকর্ম, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং আঁকা ছবি বিস্তর। সেই সঙ্গে রয়েছে 'সপ্ত শিল্পী গোষ্ঠী'র (Gnoup of seven) আঁকা অঢেল ছবি।

এঁদের একজন নৈসর্গিক দৃশ্য আঁকার জন্য তুষারপাত, ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে ক্যানেডার বনাঞ্চলের সৌন্দর্য্যকে চিত্রপটে ধরে রাখার জন্য বহুদিন নির্জ্জন বনে বাস করেছিলেন। বহুদিন কেউ তাঁর খোঁজ পায় নি অবশেষে একদিন জঙ্গলের এক ভগ্ন তাঁবুতে আবিষ্কৃত হল তাঁর সমাপ্ত অসমাপ্ত বহু ছবি এবং সেই সঙ্গে তাঁর মৃতদেহের অবশিষ্ট কিছু কঙ্কাল।

অধুনা বহু গুণগ্রাহী ব্যক্তির আগ্রহে এক আর্ট গ্যালারী স্থাপিত করে সেখানে সেই সব ছবি রাখা হয়েছে।

এসব শুনলে ওখানে যাবার আগ্রহ ত হবারই কথা। তাই কালকের অভিযানে প্রস্তুতির তাগিদে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেলাম সবাই, চোখে তখনো নায়েগ্রাদর্শনের ঘোর লেগে আছে।



[ক্যানেডার ম্যাক মাইকেল শিল্প সংগ্রহশালা]

টরেন্টো, ক্যানেডা,

সকালে ঘুম ভাঙ্গল ছবি দেখার তাগিদ নিয়ে। সবাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে ৮া০ নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমাদের দ্রষ্টব্য "দি ম্যাক মাইকেল ক্যানেডিয়ান কালেকসন্"।

সপ্ত শিল্পীগোষ্ঠীর আঁকা প্রতিকৃতি, ক্যানেডার দৃশ্যাবলী ও অন্যান্য কাজ এই সংগ্রহের বড় আকর্ষণ। তবে স্থানীয় আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের নানা গোষ্ঠীর শিল্পকর্মের সংগ্রহও এঁদের সুপ্রচুর। এঁদের আঁকা ছবি, পোষাক, আসবাব পত্র, নিত্যকার গৃহকর্মের নানা সরঞ্জাম, লোকশিল্প, এবং তার সঙ্গে রয়েছে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসী শিল্পীদের অভিনব পদ্ধতিতে আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য্য। তাঁরা পুরাতনকে নূতন ভাবে রূপায়িত করতে প্রয়াসী ;

উড়ালপুলের পর উড়ালপুল পার হয়ে আমাদের গাড়ী ক্যানেডিয়ান ন্যাশানেল টাওয়ারের পাশ দিয়ে চলেছে। হঠাৎ গাড়ী বাঁক নিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম একটা ছোট বিমান বন্দরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি! তাতে ৬০/৭০ টা এক ইঞ্জিনের বিমান দাঁড়িয়ে আছে। এসব বিমান নাকি এখানকার খামারের মালিকদের নিজস্ব সম্পত্তি। খুব বড়লোক এরা ; অনেকের শুধু গাড়ী ঘর, নিজস্ব বিমানও রয়েছে। এর একটা বড় কারণ অঢেল জমি, তুলনায় লোক সংখ্যা যৎসামান্য। পঞ্চবার্ষিকীর পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্ত্বেও সবই কল্পনাই থেকে যাচ্ছে ; আমাদের কোনো সমস্যার যে সমাধান হচ্ছেনা-তার একটা মস্ত বড় কারণ ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ। শুধু মধ্যবিত্তদের মধ্যে 'পরিবার

পরিকল্পনা'র চেতনা জাগ্রত হয়না ;—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে-এ চেতনা পূর্ণ জাগ্রত না হওয়ায় বরং গড়পড়তার বুদ্ধিবৃত্তির মান নীচের দিকেই নামছে। যাক্—আরাম কেদারায় শুয়ে দেশোদ্ধারে আর কাজ নেই ;—আবার ম্যাক মাইকেল 'ক্যানেডিয়ান কলেকশান'এর বিষয়েই মনোনিবেশ করা যাক্।

আমরা ত যাব শিল্পসংগ্রহশালা দেখতে; তবে রাস্তা যে বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে! দু'ধারে বনবৃক্ষের শ্রেণী ; রাস্তার দু'ধারে অযত্ন বর্দ্ধিত তৃণ আর পুষ্প,—গাছের ফাঁকে ফাঁকে সুদূর বিস্তৃত তৃণভূমি কখনো কখনো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু লোকালয় কোথায়? ক্রমে জঙ্গলের ভিতরে দু'চারটা' লগ হাউস' চোখে পড়ছে। এক সময় ঘুরতে ঘুরতে চাঁদুর গাড়ী একটা সুন্দর গ্রাম্য বাগান বাড়ীর পাশে এশে দাঁড়াল। চাঁদুর পেছনে পেছনে আমরাও নেমে পড়লাম। আশে পাশের যে কয়েকটি বাড়ী দেখতে পাচ্ছি সেগুলিও লগ কেবিন, বাইরে থেকে দেখলে মোটা মোটা আধখানা করে চেরা গাছের গুড়ি পরপর সাজিয়ে দেয়াল হলে কি হবে—ভিতরে আধুনিকতম সরঞ্জাম—যথা ঘর গরম রাখার জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, ফ্রিজ, রেডিও রঙ্গিন দূরদর্শন যন্ত্র, টেলিফোন, রান্নার গ্যাস, চুল্লি, ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা সমন্বিত অত্যাধুনিক স্নান তথা শৌচাগার—কি আছে আর কি নেই!

এখানে এখন বসন্ত কাল,—ফুলের দিন ঘাসের গালিচায় মোড়া আঙ্গিনায় অজস্র রঙ্গিন ফুল,—কেয়ারী করা বাগানে লাল, নীল, বেগুনি, হলদে—নানা রঙ্গের ফুলের মেলা,—তবে গন্ধবিহীন। এখানকার কাননও তেমনি কূজনহীন। সামনে একটা ছানা শুদ্ধ ভালুক,—না না ভয়ের কিছু নেই ; জীবন্ত নয়—প্রস্তর মূর্ত্তি মাত্র—পাথরে খোদাই মোটা কাজ, কিন্তু পাকা হাতের কাজ।

ভিতরে ঢুকে টিকিট কেনা হল ;—শিশুদের বেলা মাপ আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বেলা অর্দ্ধ, ভালই ব্যবস্থা বলতে হবে, বার্দ্ধক্য ত দ্বিতীয় শৈশব। আজ একপাল শিশুসহ এক শিক্ষিকা এবং বেশ কিছু ছাত্র-

ছাত্রী সহ এক অধ্যাপিকা আমাদের একই সঙ্গে এসেছেন এই শিল্পসংগ্রহ-দেখতে। চাঁতুই আমাদের প্রদর্শক ; তাকে অনুসরণ করে প্রথমেই গেলাম সপ্ত শিল্পী গোষ্ঠীর চিত্রকলা দেখতে।

বিভিন্ন ধরণের ছবি এঁরা এঁকেছেন,—প্রতিকৃতির সংখ্যা কম না হলেও ক্যানেডার নানা অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যই বেশী। কোথাও মেরু-অঞ্চলের বরফে ঢাকা পাহাড় ধাপে ধাপে নেমে এসে বরফাবৃত সমুদ্রে অবগাহন করছে ;—কোথাও বা বরফাবৃত সমুদ্র আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘ, কোথাও বা নিস্পত্র রিক্ত বৃক্ষশাখা বরফে ঢাকা জমিতে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কোথাও বা গভীর জঙ্গল, বরফগলা উপলব্যথিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, কচি কিশলয়ে ভরা বৃক্ষশ্রেণী, বলিরাঙ্কিত বৃদ্ধ ওক আর কৃষ্ণাভ হরিৎ পাইনের অরণ্য ;—তার মধ্যে ক্যানেডার সুপ্রসিদ্ধ হরিণ যূথ। কোথাও রয়েছে চোখ ধাঁধান রঙ্গে আঁকা ফল (fall)-এর অরণ্যানী। অক্টোবরে এখানকার বনভূমি নাকি রঙ্গের নেশায় পাগল, পাতা ঝরার পূর্বে, গাছে গাছে পাতাদের রং বদলাবার হিড়িক নাকি আমাদের দেশের পেশাদার রাজনৈতিক 'আয়ারাম গয়ারাম'দের দল বদলের হিড়িককেও হার মানায়।

গাছের পাতার;—বিশেষ করে মেপল গাছের পাতার গাঢ় সবুজ থেকে ধীরে ধীরে ফিকে হলদে সবুজ, ঈষৎ বাদামী, হলদে, জরদ, ফিকে থেকে গাঢ়, গাঢ় থেকে গাঢ়তর গাঢ়তম লাল, বাদামী লাল রক্ত লোহিত (Ox-blood), ঈষৎ নীলাভ লাল বা মেজেন্টা রং-এর ক্রমিক পরিবর্তন-কেই এঁরা বলেন fall colour বা ফলের বর্ণসম্ভার। এসবের ছবি দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় কাদম্বরীতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার লাল রঙ্গের কথা। তেলরঙ্গে আঁকা সে সব ছবি একেবারে জীবন্ত,—বাস্তবতুল্য। দেখে খুব ভাল লাগল। আমাকে 'ফল'-এর অরণ্য দেখাতে পারল না বলে চাঁতুর মনে দুঃখ ছিল। তাকে বল্লাম-এ সব ছবি দেখার পরও ফলের অরণ্য দেখার বাকী কিছু রইল কি !

সপ্ত শিল্পীগোষ্ঠীর আঁকা প্রতিকৃতি থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যই আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছে। ক্যানেডার নদ নদী, হ্রদ, সমুদ্র পর্বত ও বনাঞ্চলের সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁদের তুলির টানে, রং এ রেখায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এঁদের আঁকা জলের রঙ্গে আঁকা ছবি বিরলদর্শন, তবে যে কয়টি রয়েছে—তাতে যেন পশ্চিমী ঢং-এর জল রং পদ্ধতির পূর্ণবিকাশ। খুব ভাল লাগল এই সপ্ত শিল্পী গোষ্ঠীর ছবিগুলি !

এবার আমরা চল্লাম ক্যানেডার আদিম অধিবাসীদের শিল্পকলা দেখতে। এখানে রয়েছে তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র, নানাধরণের সরঞ্জাম, সমুদ্রে বা নদীতে মাছধরার জন্য সরু সরু বিশেষ ধরণের নৌকা, বরফেএর মুল্লুকে বাস করার উপযোগী চামড়া ও হাড়ের তৈরী তাঁবু, বরফের মুল্লুকের উপযোগী জুতো, জামা, পোষাক, পরিচ্ছদ, শিকারের জন্য ঢাল, বল্লম, তীর ধনুক—কত কি !

তাদের বিভিন্ন ধরণের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনধারার ঐতিহ্যবাহী ছবিও দেখলাম অনেক;—সাবলীল রেখার প্রয়োগে কেবল মাত্র লাল ও কাল রং দিয়ে আঁকা। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা শ্বেত-সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত। তবুও নিজেদের ঐতিহ্যচ্যুত হতে তারা নারাজ। তাদের ছবিতে রয়েছে পুরাণো ধারার সামান্য রদবদল করে অসম্ভব জোরালো রেখায় প্রাচীনের নবায়ন। 'ওজিবওয়া' গোষ্ঠীর এই শিল্পীদের কাজ যেন প্রাচীন জীবনবোধের সঙ্গে বর্তমানের এক সেতু স্বরূপ। তাদের মতে এই সব ছবি দেখতে হয়—মন দিয়ে যতটা-ততটা চোখ দিয়ে নয়। তবেই তাদের অনুপ্রেরণার নব নব স্তর দ্রষ্টার চোখে একে একে ফুটে উঠে ! আমার কিন্তু মনে হল—এও এক ধরণের 'স্যু-রিয়েল (surreal) ছবি।

অবশ্য এ কথা মেনেই নিচ্ছি-শিল্পকলার মূল্যায়ন তাড়াহুড়ো করা সবজান্তা ভ্রমণবিলাসীদেরচোখ দিয়ে অসম্ভব। তবে রস সম্ভোগ কিছুটাও ত হল;—সেটা ও কি কম লাভ !

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। বহু ঘন সবুজ বৃক্ষ শোভিত সরণী পার হয়ে, বহু উড়াল পুল পেরিয়ে, অণ্টারিও হ্রদকে আড় চোখে দেখতে দেখতে এক সময় বাড়ী ফিরলাম।

তুরন্ত টরেন্টো দর্শন এবারের মত সমাপ্ত হল। এবার উল্টোরথ; ঘরে ফেরার পালা। চট করে আমেরিকার সীমানায় ঢুকে পড়ে তাড়াতাড়ি মিনিয়াপোলিস ফেরা সম্ভব ছিল; কিন্তু পঞ্চহ্রদ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে ঘরে ফেরাই সবার ইচ্ছা; তাতে অবশ্য পূরো দেড় দিন ক্যানেডায় অন্টারিও প্রদেশেই থাকতে হবে। তারপর 'স্যঁ স্যুঁ মেরী' পার হয়ে আমেরিকার সীমানায় ঢুকে মিশিগান ও উইস্‌কন্‌সিন্ অতিক্রম করে মিনেসোটার জমজ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করা হবে। এই কর্মসূচীই শেষ পর্য্যন্ত বহাল থাকল।

কাল সকালেই টরেন্টো থেকে বিদায়ের পালা। তাই বিকেলে কোথাও না গিয়ে জিনিষ পত্র গুছিয়ে নেওয়া হল। তারপর খাওয়া ও আখেরী আড্ডা শেষ করে যখন ঘুমাতে গেলাম তখন আমাদের টরেন্টোতে শেষের রাতের শেষ রাত।



প্রত্যাবর্তন পর্ব

[হিউরন হ্রদের তীরে তীরে সঁ্য স্যঁ মেরী ম্যানিষ্টিকে রাত্রিযাপন]

ম্যানিষ্টিক, ক্যানেডা

"আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন" ;—আজ সকালেই টরেন্টো থেকে বেরিয়ে হিউরন হ্রদের পাশ দিয়ে যাবার কথা। এখনো ক্যানেডার এলাকায় পুরো দেড় দিন থাকতে হবে; সুতরাং "বিদায় ক্যানেডা" নয় – বলছি "বিদায় অন্টারিও! বিদায় টরেন্টো! অনেক কিছু নিয়ে গেলাম তোমাদের কাছ থেকে যা মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রইল।"

প্রবাসী ছোট ভাই এর কাছে বিদায় নিয়ে গৃহিনী ধীর পদক্ষেপে গাড়ীতে উঠে বসলেন। চাঁদু বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে ম্লান মুখে হাসি এনে হাত নেড়ে বিদায় জানালে পিন্টুর গাড়ী চলতে শুরু করল; —আমাদের প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হল এবার।

টরেন্টো শহর ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ী ৪০০ নম্বরের রাজপথ ধরে চলতে লাগল। অন্টারিও হ্রদ পূর্বেই দেখা হয়ে গিয়েছে। সেনডাস্কিতে ইরি হ্রদ রসিয়ে রসিয়ে দেখেছি। এবার যাব হিউরন হ্রদের পাশ দিয়ে।

এখানেও আমেরিকার মত অতি চমৎকার ব্যবস্থা; সেই একই রকম উজান ভাটি দুই মোটর প্রবাহের জন্য আলাদা আলাদা রাস্তা,—তাতে একাধিক গলি (lane), সেই একই রকম কিছু দূরে দূরে পেট্রোল পাম্প, বিশ্রামাগার, শৌচাগার, খাবারের জায়গা ইত্যাদি রাস্তার পাশে পাশে।

আমাদের রাস্তার দু'পাশে নাতি আন্দোলিত মাঠ ঘাট, দিগন্ত

বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র, ক্ষেতখামার, পাইন, মেপল, ওদের সারি ;—দূরে দূরে কৃষকদের বাড়ী। ছোট খাল বিল, ঘনজঙ্গল, নদীনালা যেতে যেতে নয়নগোচর হচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা 'সেমকো' হ্রদের কাছে পৌঁছে গেলাম। কৃষ্ণনীল নিস্তরঙ্গজল ,—হ্রদের মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ। এটি হিউরন হ্রদের একটা ছোট খাঁড়ি। ওপারে নীলাভ



বৃক্ষশ্রেণী দেখতে পচ্ছি। নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। আরও ত্রিশ কিলোমিটার পার হবার পর হিউরন হ্রদের আর একটা ছোট খাঁড়ির সাক্ষাৎ মিলল। মানচিত্রখানা খুলে দেখলাম,—ধারে কাছে বহু দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে ,—যেমন ভিক্টোরিয়া হারবার। যাবারও বিশেষ অসুবিধা নেই, 'পোর্টসেভান' থেকে সেখানে যাবার পাকা রাস্তা রয়েছে 'জর্জিয়ান বে ন্যাশনেল পার্কও কাছেই। রয়েছে ত সবই ,—নেই শুধু সময়।

ও সব বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করে আমরা ৬৯ নম্বর রাজপথ বেয়ে চ:লেছি। পাশে এখন জর্জিয়ান উপসাগর, রাস্তার ডান পাশে পাহাড়।

এ অঞ্চলটা অরণ্য ও খনিজ সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। দু'পাশের ঘন জঙ্গলে নানা জাতের গাছ,—পাইন, সিডার, বার্চ্চ, ওক, আরও নাম-না-জানা কত কি! পাইনই বা কত বিভিন্ন রকমের! মাঝে মাঝে ছোট বড় ঝিলের মত জলা জায়গা,—তাতে লম্বা লম্বা জলজ ঘাস আর ফুল, হাঁসও কয়েকটা জায়গায় দেখতে পেলাম।

পাহাড়ের মাথায় মাথায় পাথর চূর্ণ করে জমা করে রাখা,—ধাতু গর্ভ শিলাময় এসব পাহাড়। জর্জ্জিয়ান উপসাগর এখনো আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেনি।

হিউরন হ্রদের উত্তরাংশ পড়েছে ক্যানেডায়, বাকীটা আমেরিকায়। এ হ্রদের উত্তরাংশে বহু ছোট খাট দ্বীপ রয়েছে। ককবার্ণ ও মেনিটৌলিন এই দুটি দ্বীপ মিলে হিউরনকে যেন দ্বিধাবিভক্ত করেছে। উত্তরাংশের উপসাগর সদৃশ বিরাট জলরাশিকে ওরা বলে জর্জ্জিয়ান উপসাগর। তার পাশ দিয়েই আমরা চলেছি। চোখের সামনে সাদা মেঘ আর আকাশের নীচে-সবুজ পাহাড় ও ঘন কৃষ্ণনীল বৃক্ষশ্রেণীতে আর হ্রদের নিথর জলে প্রতিবিম্বিত আকাশের রঙ মিলে—কী এক অবর্ণনীয় মায়ারাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। পঞ্চহ্রদ পরিক্রমা আমাদের সত্যই সার্থক হল। এই অপরূপ মায়ারাজ্যের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আমরা একে একে মিডল্যাণ্ড, ফুটেস্‌বে পার হয়ে প্যারী সাউণ্ডএ পৌছে গেলাম। এখানেও রয়েছে হ্রদ, আকাশ, অরণ্যানী, পাহাড—সবুজ সুনীলে বিরচিত অপূর্ব এক স্বপ্ন। চোখ ভরে, মন ভরে, এই নয়ন বিমোহন দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ক্রমে 'নবেল' 'বেরিলস্টেশান, 'ব্রিল' প্রভৃতি জনপদ পার হয়ে গেলাম। আমাদের রাস্তা ৬৯ নম্বর রাজপথ এখনো জর্জ্জিয়ান উপসাগরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে 'গ্রাণ্ডিলেক' প্রাদেশিক পার্ক এর পাশ দিয়ে এগিয়ে 'বিগউডে' এসে পৌছালাম। কিন্তু নাম বিগউড হলেও বৃহৎ বনানী ত চোখে পড়ল না।

এতক্ষণে জর্জিয়ান উপসাগর অদৃশ্য হয়েছে;—যদিও গাছপালা তেমনি সবুজ এখনো। ঢালু পাহাড়, নাতিঘন বন আর তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ভেদ করে চলতে চলতে আমরা 'সাডবুড়ি' পৌঁছে দেখলাম— 'সাডবুড়ি' শুনতে সাতবুড়ির কাছাকাছি হলেও সবুজ তৃণময় প্রান্তরে আর তাজা সবুজে ছোপান গাছপালায় একটা ভরা যৌবনের ভাব সবত্র —মোটেও সাতবুড়ি নয়।

অনেকক্ষণ একটানা গাড়ী চলেছে; এখন গাড়ী, তার চালক এমন কি আরোহীবর্গ—সকলেরই সাময়িক বিশ্রাম এবং খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন। দৌহিত্রটি আজ অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছে; বিরক্তি নেই, খাওয়া দাওয়াতে আপত্তি নেই—এমন কি খানিকটা ঘুমিয়েও নিয়েছে। একটা উপযুক্ত স্থানে গাড়ী থামিয়ে গাড়ীতে পেট্রোল ভরে নেওয়া হল। তারপর সদ্যনিদ্রোত্থিত দৌহিত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে একটা ভাল রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করা হল। সবাই নিজ নিজ অভিরুচি মাফিক কিছু খেয়ে নিলাম। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ২৪ ঘণ্টা ধোপদুরস্ত রাখা হয় এসব জায়গা। খাওয়া দাওয়া সেরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে হয়ে সবাই মিলে গাড়ীতে পুনরাসীন হওয়া গেল।



এবার আমরা ৬৯ নম্বর ছেড়ে ১৭ নম্বর রাজপথ ধরে চলেছি। আহা! বয়সের বেলাও যদি ঠিক এমনটি করা যেত!

রাস্তার দু'পাশে অবশ্য তেমনি সবুজের সমারোহ। আশে পাশে প্রচুর ছোট খাট হ্রদ। 'এপেনোলা' ও 'ওয়েরউড' পার হয়ে যখন

আমরা—'মেস্‌সি'তে এসে পৌঁছালাম—দেখি সেই পুরানো মিশিগান হ্রদ আবার হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে,—নাম ভাঁড়িয়েই সে আসে;—এবারও এসেছে নূতন নামে। এখন তার নাম নাকি 'নর্থ চ্যানেল,'। হ্রদের তীরে তীরে অজস্র গাছপালা, ঘরবাড়ী, মোটেল, চড়ুইভাতির জায়গা। যতই পশ্চিমে যাচ্ছি—ক্ষেত খামার বাড়ছে—আর পাহাড়ের মাথায় মাথায় কোথাও ঘনবন, কোথাও বা খনির পর খনি। এ জায়গাটা যেমন উর্বর তেমনি আরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ;—আবার প্রচুর তামা আর উইরেনিয়ামের খনির জন্যওএর খ্যাতি যথেষ্ট। অরণ্য ও জলাভূমি জলার ও খচর (খচ্চর নয়) প্রাণীতে পরিপূর্ণ এ জায়গাটা শিকারীদের পক্ষে সার্থক স্বপ্ন।

'ইলিয়ট' হ্রদকে পাশে রেখে 'স্পাগ্নি' ও 'এলগোমা মিলস্‌' অতিক্রম করে 'ব্লাইডরিভার'এ এসে পৌঁছালাম। স্যঁ স্যু মেরী এখনো ১৪০ কিলোমিটার দূরে।

এদিকে গাড়ীতে তেল ভরার প্রয়োজন পড়েছে এবং আমাদেরও চা খাবার। সুতরাং সুবিধামত একটা জায়গায় গাড়ী থামিয়ে গাড়ীকে পেট্রোল খাওয়ান হল এবং আমরাও চা পান করে চাঙ্গা হয়ে নিলাম।

অচিরে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। আজ ঠাণ্ডা কম; আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে রৌদ্রের তীব্রতাও নেই। আজ আমরা অতি মনোরম আবহাওয়ায় অতি মনোহর দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চলেছি। ক্রমে 'আয়রণ ব্রিজ' পার হয়ে 'হেসালন'এ ঢুকলাম। এখানেও দৃশ্যাবলী তেমনি মনোহর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা 'ক্রস মাইনস্‌' এ এসে পড়লাম। নর্থ চ্যানেলের খাঁড়ি আমাদের পাশ দিয়ে চলেছে। এ জায়গাটাতে খনি বিশেষ দেখতে পাচ্ছি না বটে, তবে বলতেই হবে এটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খনি বিশেষ। হ্রদ এখানে নাতিবৃহৎ,—গাছ-পালা, বাড়ীঘর তার তীরে তীরে। সাজান বাগানের মত রাস্তার দুই দিক;—তাতে ঘাসের সবুজ গালিচায় রঙ্গিন বনকুসুমের কাশ্মীরী কাজ। 'ডেস্‌বেরেটস্‌' এসে মনে হল-স্যঁ স্যু মেরী যেন পৌঁছে গেছি। হ্রদের

নানা ফাঁড়ি এখানে সেখানে উঁকিঝুঁকি মারছে। ক্রমে বাররিভার ও 'ইকোবে' পার হয়ে চল্লাম। এক পাশে রইল জর্জ্জলেক আর সুগার আইল্যাণ্ড। সীমান্তবর্ত্তী শহর এটা; একটা পুল পার হলেই আমেরিকা।

শুনেছিলাম—কন্যাকুমারীতে যেমন তিনসমুদ্রের সঙ্গম, সাঁ স্যুঁ মেরীতেও তেমনি তিন হ্রদের সঙ্গম। কিন্তু ঠিক তা নয়। আসলে একটা প্রণালী সুপিরিয়র হ্রদকে হিউরণ হ্রদের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই দু'টি হ্রদ এক সমতলে নয়; তাই জাহাজ চলাচলের জন্য 'লক'-এর ব্যবস্থা রয়েছে। পানামাতে এই রকম একাধিক লক প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করেছে। তবে সেটা যদি হয়ে থাকে পক্ষীরাজ এটা তাহলে ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া। আর মিশিগান হ্রদ ও ইরি হ্রদকে সংযুক্ত করেছে 'ম্যাকিনেক' প্রণালী,—সাঁ স্যুঁ মেরীর কিছুটা দক্ষিণে। যাকগে-ভৌগলিক প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানা যাক্।

ক্যানেডার অন্তর্গত হ্রদগুলির পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে বহু নয়ন নন্দন দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে আমরা ক্যানেডা আর আমেরিকার-সীমান্তবর্ত্তী শহর সাঁ স্যুঁ মেরীতে এক সময় উপনীত হলাম। ছোট্ট হলেও ছিমছাম সুন্দর শহর। হ্রদের পাড়ে পাড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ান হল। লোক-মুখে শুনেছিলাম এখানকার উপকূল নাকি মাছধরা নৌকায় ভরে থাকে, একটাও কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি। পুল পার হলেই আমেরিকা। এবার ক্যানেডার মায়া কাটিয়ে সাঁ স্যুঁ মেরীর পুল পেরিয়ে আমেরিকায় এসে ঢুকলাম। বিদায় ক্যানেডা! নয়ন বিমোহন তোমার অপরূপ-রূপ! দেখে ধন্য হয়েছি আমরা।

পুল পার হয়ে দক্ষিণদিকে যেই এলাম অমনি আমেরিকাতে এসে গেলাম। আর একপ্রস্ত পাসপোর্ট ও ভিসা পরীক্ষা পর্ব চলবে।

তবে এই দুই দেশের মধ্যে হৃদ্যতা যে কতটা তা তাদের পাসপোর্ট আর ভিসা পরীক্ষা থেকেই মালুম হয়;—নামমাত্র দেখার ভান করে তারা আমাদের ছুটি দিয়ে দিল,—না বলব আমাদের আমেরিকায় পুনঃ প্রবেশকে প্রায় অভিনন্দন জানাল!

পঞ্চহ্রদ পরিক্রমার প্রধান পরিকল্পক পিন্টু মানচিত্র ঘেঁটে ঠিক করে রেখেছিল—পথে 'ম্যানিষ্টিক'এ রাত্রি যাপন করা হবে। তাতে খুব নিকট থেকে মিশিগান হ্রদ দেখা হয়ে যাবে। সন্ধ্যা তখনো হয়নি; দেখতে দেখতে 'নিউবেরী' পার হয়ে "গোল্ডসিটি"তে এসে পৌছালাম। মিশিগান হ্রদের তীরবর্তী ছোট্ট একটি শহর; 'সুবর্ণ শহর'—নাম একেবারে অসার্থক নয়—সবুজে সুনীলে আর লাল লাল ছোট ছোট বাড়ীতে সু-বর্ণসমৃদ্ধ শহর বৈ কি এটা।

শহর পেরিয়ে অগ্রসর হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ম্যানিষ্টিকের কাছাকাছি পৌছে গেলাম। আমরা উঠব—'ব্রেকাস মোটেল'-এ সেটা আবার খোদ শহর থেকে দুই মাইল আগে পড়বে। গাড়ী অচিরেই মোটেলের দোর গোড়ায় এসে থামল।

ভারী সুন্দর মোটেলটির অবস্থান। এক পাশে রাস্তা,—রাস্তাটা-পার হয়ে ১০০/১৫০ গজের মধ্যেই মিশিগানের টলটলে জল। মোটেলের আঙ্গিনায় সবুজ ঘাসের কার্পেট, কেয়ারী করা ফুলের বাগান-দু'চারটা অতি সুন্দর পাইন গাছ, মন্দিরের চূড়ার মত তাদের মাথা আকাশের পটে চিত্রিত।

প্রায়-রাজকীয় এই মোটেলগুলিতে নেই কি! মোটরের জন্য-গ্যারেজ থেকে ঘরে ঘরে রাঙ্গন দূরদর্শন যন্ত্র, ফ্রিজ, উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, আগাগোড়া পুরু গালিচাবৃত ঘরে নরম গদিযুক্ত বিছানা, কম্বল, দূরভাষ যন্ত্র (telephone), রান্নাঘরে বিদ্যুৎ বা গ্যাস সেবিত চুল্লি, ঠাণ্ডা ও গরম জলযুক্ত স্নান-তথা-শৌচাগার, হাত মুখ ধোবার জন্য সিঙ্ক (Sink), বাসনপত্র, কাপ, প্লেট, গ্লাস, টেবিল, চেয়ার, চিঠি লেখার কাগজ ও খাম এবং একখানা বাইবেল—ত অবশ্যই থাকবে। এই কারণেই এদেশে ভ্রাম্যমানদের লোটা কম্বল বয়ে বেড়াতে হয় না। রান্না করা খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই বটে, তবে পাতের কাছে না হোক হাতের কাছে খাবার দাবার ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দোকান এবং পেট্রোল পাম্প থাকবেই। মোটেলের ম্যানেজারকে বলে পিন্টু একটা ভাল দেখে কামরার ব্যবস্থা করে নিল। অতঃপর জিনিষপত্র নামান, গুছিয়ে রাখা,

সামান্য কিছু কেনা-কাটা রান্না-বান্না এসব অবশ্যকর্তব্য কর্মের তোড়-জোড় চল্ল। একমাত্র নিষ্কর্মা ব্যক্তি আমি দৌহিত্রটির হাত ধরে চল্লাম মিশিগানের তীরে বেড়িয়ে বেড়াতে।

রাস্তার এপাশটায় মোটেলসংলগ্ন বাগান,—তাতে বেশ কয়েকটি অতি সুন্দর পাইন গাছ, পেট্রোল পাম্প ও অন্যান্য খাদ্য পানীয়ের বিপণি ইত্যাদি অন্য পাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা এক ফালি মাঠ এবং তার পরেই দিগন্ত প্রসারী মিশিগানের কালো জলে সন্ধ্যার ছায়া। ঢেউ প্রায় নেই—বাতাস বন্ধ, আকাশ থমথমে—আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল বুঝি! একটু পরেই মিশিগানের ওপারে ঝাপসা করে বৃষ্টি নামল।

"ওপারেতে বৃষ্টি এল, ঝাপসা গাছ পালা"।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক বিষন্ন বাদল সন্ধ্যার ছবি মনে পড়ে গেল। এ পাড়েতে মেঘের মাথায় একশ' না লোক—গুটিকয় মানিক নিশ্চয়ই জ্বলে থাকবে;—নইলে ঝরঝর বারিবর্ষণের সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণ হবেই বা কেন। ঝড় জল থেকে বাঁচার তাগিদে মোটেলের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার জন্য নাতি কোলে সে দিন যে দৌড়টা দিয়েছিলাম তাতে ওলিম্পিকের ১০০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড ম্লান হয়ে যাবার কথা।

হাঁফাতে হাঁফাতে মোটেলের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসে কাঁচের জানালার পাশে বসে রিমঝিম বর্ষণ আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণ উপভোগ করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক অশ্রান্ত বর্ষণান্তে আকাশ তখনকার মত থামল। ইতিমধ্যে মাতা ও কন্যার তৎপরতায় নৈশভোজের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে। বাচ্চাটিকে কোনো রকমে খাইয়ে দাইয়ে আমরাও নৈশাহারে বসে গেলাম।

আজ পিন্টু একাই ৫০০ মাইলের বেশী গাড়ী চালিয়েছে। আবার কালের জন্য ৪০০ মাইল পথ এখনো বাকী। তার বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন। তাই অযথা বিলম্ব না করে তক্ষুনি সবাই শুয়ে পড়লাম। বাইরে তখন রিমঝিম শবদে বরষে।

[ম্যানিষ্টিক মিশিগান উইসকনসিন মিনিয়াপোলিস্]

মিনয়াপোলিস

ঘুম ভেঙ্গে দেখি—নির্মেঘ নীলাকাশ, মিশিগানের কালো জলে আলোর ঝিকিমিকি, সত্তস্নাত গাছ পাতা পথ ঘাট সব কিছু যেন একটা খুসী খুসী ভাব। দৌহিত্র পুঙ্গব তখনো নিদ্রামগ্ন। চা খেয়ে একাই চলে গেলাম মিশিগানের তীরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একান্তে প্রকৃতি সম্ভোগ করতে। প্রকৃতি সম্ভোগটা হয়ত কিঞ্চিৎ বেশীই হয়ে গিয়েছিল। ফি'র এসে দেখি—সবাই প্রস্তুত, প্রস্তুত হতে বাকী কেবল আমি। নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে দৌড়ে স্নানাগারে ঢুকে পড়লাম। তাড়াতাড়ি স্নানের পালা চুকিয়ে ধূমায়িত অন্নের থালায় বসে গেলাম।

যাক্—খাওয়া দাওয়া সেরে মালপত্র সমেত গাড়ীতে উঠে বসতে বসতে সেই ৯॥ টা,—অবশ্য আজকের বিলম্বের জন্য আমিই দায়ী।

কাল স্যঁ স্যুঁ মেরী পার হবার পর থেকেই আমরা আমেরিকার মিশিগান রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের পথ—অর্থাৎ ২ নম্বর রাজপথ এখনো মিশিগান হ্রদেরই এক অংশ—'গ্রিনবের' পাশ দিয়ে যাচ্ছে। নাম 'গ্রিনবে' হলেও জল কৃষ্ণবর্ণ। না-না সব কিছুতেই এত দোষ ধরতে নেই,—শখ করে কানা ছেলের নামওত বাপ মা পদ্মলোচন রেখে থাকেন। তবে কি জান—জল তার—

'কালো—সে তা যতই কালো হোক'—তবুও তার 'কালো হরিণ চোখে' রূপের অন্ত নেই। তার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির চূর্ণ ঢেউয়ে আলোর ঝিলিক,—আকাশে সাদা মেঘের খেলা, তীরে তীরে কৃষ্ণাভ সবুজ পাইন বার্চ্চের বন, ছোট ছোট কাঠের বাড়ী তার মাঝে

মাঝে, —জলে সাদা পাল তোলা নৌকার রাজহংসের মত স্বচ্ছন্দ জলে বিহার, আর জলের ধারে ধারে জলজ ঘাস আর ফুল।

রাস্তার অন্য পাশে চষা অচষা মাঠের পর মাঠ ঢেউ তুলে দিগন্তে ধাবমান। 'রেপিড রিভার' পেরিয়ে আমাদের গাড়ীও Rapidly চলতে শুরু করল.—অনতিবিলম্বে 'এস্কেনবা'র কাছে পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট ছিমছাম সুন্দর শহর। 'গ্রিনবে'র পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক সময় আমরা 'মেরিনেট্টে' পৌঁছে গেলাম।

দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের এই রাস্তার সঙ্গে হ্রদের মিতালী চলছে। বাঁকে বাঁকে অদৃশ্য হচ্ছে বটে, তবে তা আবার অচিরেই মুচকি হেসে সামনে এসে দাঁড়াবার জন্যই। এ জায়গায় জলে ডাঙ্গায়, গাড়ীতে, নৌকাতে—স্বপ্নে জাগরণে কেমন যেন জড়াজড়ি।

মেরিনেট্টে' পার হতেই মিশিগান ছেড়ে 'উইস্‌কনসিন' রাজ্যে প্রবেশ করলাম। 'ওকানট'তে পৌছাতেই মিশিগান যেন বল্ল—"বন্ধু! 'এখানটে' পর্য্যন্তই আমার দৌড়; এখন তবে আসি।" বহুক্ষণের পথের সাথী সুন্দরী এই হ্রদের সঙ্গে এবার বিচ্ছেদ পাকাপাকি হতে চলল। মনে মনে বল্লাম—"বিদায় মিশিগান! চোখের আড়াল হলে বটে, মনের নয়।"

'উইসকনসিন' দিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু এক নূতন রূপে উইকনসিনকে এবার দেখছি। সেবার দেখেছিলাম—রাস্তার দু'পাশে পাইন বার্চ ওকের বন আর হাতির পিঠের মত ঢালু অচষা বনপুষ্পময় তৃণভূমি। এখানে দেখছি—সর্বত্রই চষা জমি,—কোথাও শস্যশ্যামল,-কোথাও শস্য কাটা হচ্ছে-,কাটাও বা হয়ে গেছে। দিগন্তবিস্তৃত খামারের জমি;—মাঝে মাঝে ২/৪টা পাইন গাছ,—দু'একটা কাঠের বাড়ী—আর আকাশ ছোঁয়া 'সাইলো'—অর্থাৎ বাটির টুপি মাথায় পরা বিরাট গম্বুজের মত শস্যের গোলা। মাঠ ভরা ঘাস,—তাতে পাল পাল অতি হৃষ্ট পুষ্ট সাদা কালো বাদামী—নানা রংএর গরু চরছে। কদাচিৎ এদের মধ্যে ২/৪টি ঘোড়াও দেখতে পাচ্ছি। চাষীদের বাড়ীতে বাড়ীতে একাধিক গাড়ী, কলের লাঙ্গল, ফসল কাটার যন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে।

এক জায়গায় দেখলাম—রাস্তার পাশের এক খামার বাড়াতে চাষীদের এক সভা বসেছে, সারাটা রাস্তা কাগজের শেকল, নিশান প্রভৃতি দিয়ে সাজান। জায়গাটাতে বহু গাড়ী দাঁড় করান। স্থানীয় কৃষকেরাই যান-বাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছেন। কা .বরাট লম্বা চওড়া চেহারা! ওদের গরু আমাদের মোষের মত, ওদের চেহারা অন্য রকম হলে বেমানান হত না কি? এদের বেশার ভাগ লোকের গায়েই জার্মান রক্ত। যেমন গায়ে গতরে,—তেমনি খাওয়া দাওয়া, আবার তেমনি পরিশ্রম করার শক্তি। এ রাজ্য যে অঢেল খাদ্যশষ্য, দুধ, মাখন, পনীর প্রভৃতির জন্য এত বিখ্যাত—তা এ এদের পরিশ্রমের গুণেই সম্ভব হয়েছে। সাধে কি আর এ রাজ্যকে বলে "আমেরিকার রুটীর ভাণ্ডার"।

উইসকনসিনের আসল রূপ এটাই। যাবার সময় পথের দু'ধারে যে গাছের সারি দেখেছিলাম সে সবের অবস্থান নাকি যানবাহন চলাচল জনিত শব্দের প্রতিরোধ ...।

এদের ক্ষেত-খামার আর শস্যের প্রাচুর্য্য দেখতে দেখতে 'ওয়াউসাউ' এসে পড়লাম। এইবারে আমরা রাস্তা বদলে ২১ নম্বর রাজপথ ধরে চলেছি। 'চিপ্পেওয়া ফলস্' প্রায় আমাদের রাস্তাতেই পড়বে, সেটা দর্শনীয় স্থানও বটে. কিন্তু সেখানে যাবার মত সময় নেই কারও। 'ইউক্লেয়ার' পার হবার পরই পিণ্টু আবার রাস্তা পাল্টে ৯৮ নম্বর রাজপথ ধরে চলতে লাগল মিনোমোনি পার হতেই দৃশ্যপটের পরিবর্তন চোখে পড়ল তা হলে কি মিনিয়াপোলিস্ প্রায় এসে পড়ল! ক্ষেতখামার রাস্তার দু'পাশে তত নেই যত রয়েছে গাছপালা, ঘাসে ঢাকা ঢালু জমি ছোট ছোট জলাভূমি যাকে এরা দেমাক করে বলেন 'হ্রদ'। মাঝে মাঝে টিলার মাথায় মাথায় ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ী। পথ এবার সত্যি ফুরিয়ে এল,—'রিভার ফল' পার হলেই উইস্‌কন্‌সিনের শেষ—মিনেসোটার শুরু। অদূরে সেন্ট পল, মাঝখানে মিসিসিপি নদী আর সেটা পার হলেই মিনিয়াপোলিস।

খোশ মেজাজে পিণ্টু গান ধরেছে হয়ত সেইজন্যই। 'রিভারফল' কিছুক্ষণের মধ্যেই পার হলাম। এবার আমরা সেন্ট পলের শহরতলি দিয়ে যাচ্ছি। উড়ালপুলের পর উড়ালপুল পার হয়ে চল্লাম। এবার মিসিসিপির পুল পার হলাম। শৈশব-অনাক্রান্তা মিসিসিপির দুই তীরের বৃক্ষশ্রেণী যেন জননীর স্নেহ হস্তের মত প্রসারিত হয়ে তার ধারাকে আগলে রেখেছে। এখন আমরা মিনিয়াপোলিসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি।

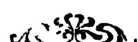
বাড়ীঘর দোকানপাট পেছনে ফেলে পিণ্টুর গাড়ী সোজা বাড়ীর দিকে না গিয়ে অন্য পথ ধরল যেন! ঠিক তাই,—বাড়ী থেকে ১৭ দিন অনুপস্থিত, ভাঁড়ারে মা ভবানী। তাই বাড়ী না গিয়ে সোজা রসদের দোকানে ঢুকে জরুরী জিনিষপত্র কেনাকাটা করে তবে বাড়ী ফেরা হল।

গ্যারেজের কাছে এসে পিণ্টু তার 'চিচিং ফাক' যন্ত্রটা টিপতেই গ্যারেজের বন্ধ দরজা খুলে গেল। ব্যাস, ১৭ দিনের দীর্ঘ ভ্রমণ—প্রায় ৪১১৩ মাইল মোটর ভ্রমন শ্রীমার কৃপায় আজ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল।

মিনিযাপোলিস শহরটাকে এখনো ভাল করে দেখা হয় নি। 'সাত সমুদ্র তের নদী' পারের "তেপান্তরের মাঠ" অতিক্রম করে কত 'অচিন অভিন্ পুরী' কত দূর দূরান্তরের দর্শনীয় স্থান হামেসাই কত লোক দেখে থাকে; দোরের পাশে ঘাসের ডগায় শিশির কণার সূর্য্যকিরণের ঝলক কেউ নাকি দেখেনা!

না—না, ভুল বোঝো না; মিনিয়াপোলিসকে আমি ভালভাবেই দেখব, তবে তার পূর্বে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন—আমার এবং তোমার উভয়েরই।

তাই ভবিষ্যতের কর্মসূচী ভবিষ্যতের জন্য আপাততঃ তুলে রাখলাম।



[মিনিয়াপোলিসের হিন্দুমন্দির বিজ্ঞান সংগ্রহ শালা
স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক সিনেমা]

মিনিয়াপোলিস,

দু'চার দিন একটানা বিশ্রামের পর চাঙ্গা হয়ে উঠলাম সবাই। মনে হতে লাগল—এবার এ শহর ও তার চার পাশটা দেখে নিলে মন্দ হয় না। শহরের আশে পাশেত বটেই, খোদ শহরেই বিস্তর ছোট বড় হ্রদ রয়েছে,—যা নিয়ে এদের গর্বের অন্ত নেই। আমাদের বাসস্থানের পাশেই ত ছোট-খাট একটা হ্রদ রয়েছে। তার চার পাশে ছোট, মাঝারি, বড—নানা আকারের গাছপালা, মাঝ দিয়ে সরু পিচের রাস্তা,—সবুজ চুলে যেন কাল সিঁথি—মাঝে কাঠের বেঞ্চ পাতা। রাস্তার পাশের লেম্পপোষ্টগুলির ভিতরে বিজলীবাতি,—বাইরে থেকে যদিও মনে হবে—যেন বিজলীবিহীন ইয়োরোপের মধ্যযুগের 'বত্মবর্ত্তিকা'। ছোট ছোট টিলার সানুদেশে বন্যঘাস ও ফুল, দেখলেই মনে হয় এ অঞ্চল একদা মূলতঃ 'প্রেয়রী' অর্থাৎ বৃহৎ বন্যতৃণাকীর্ণ প্রান্তরই ছিল।

জলে লম্বা লম্বা জলজ ঘাস, তার উপর উড়ন্ত ফড়িং দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। দু'একটা হাঁস ও মাঝে মাঝে এসে সাঁতার অভ্যাস করে যায়। পারে ঝোপঝাড়ে অসংখ্য লাল লাল ছোট ছোট ফল ফলে আছে,—দেখলে ফুলের স্তবক বলে ভ্রম হয়। খুবই সুন্দর। সারা শহরটাই যেন সর্বক্ষণ সেজে গুজে বসে আছে।

গাছপালা এরা কাটে কম; জঙ্গল সাফ করে দিয়ে জনপদ গড়বার প্রয়োজন এদের নেই। লোক সংখ্যা এতই কম যে এত বড় শহরের শহরতলি দেখলে মনে হবে বুঝি বা জঙ্গল! নাতি উচ্চ টিলার সংখ্যাও

নেহাৎ কম নয় সারা শহর ও শহরতলি জুড়ে। তাদের মাথায় মাথায় বা ঢালুতে গাছে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কাঠের বাড়ী, সামনের দিকটাতে সযত্নে বর্দ্ধিত ঘাসের গালিচাতে অসংখ্য বিবিধ বর্ণের ফুলের মেলা।

দোকান পাট বা বড় বড় বাড়ীগুলির আশে পাশেও খুব যত্ন করে সাজিয়ে লাগান দামী দামী বিভিন্ন জাতের পাইন ও মেপল গাছ। বড় হোক ছোট হোক সব বাড়ীর চারদিকেই প্রচুর জায়গা; তাতে ঘাসের লন ও ফুলের বাগান থাকবেই। মধ্য এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর



পর্য্যন্ত এই কুসুমসম্ভার সর্বত্র। অক্টোবর মাস থেকেই এখানে 'ফল' শুরু হয় অর্থাৎ পাতা ঝরে যাবার আগে পাতার রং বদলের পালা শুরু হয়ে যায়—বিশেষ করে মেপলের বনে বনে। চিরহরিৎ পাইনই শুধু তার কৃষ্ণাভ সবুজ সৌন্দর্য্যের পশরা নিয়ে উর্বশীর মত দাঁড়িয়ে থাকে; নইলে এখানকার বনভূমি শীতে নিঃস্ব নিষ্পত্র। ফল অর্থাৎ প্রাক-পাতা ঝরার সময় হলুদ, বাদামী, পাণ্ডুর, লাল-ফিকে থেকে ঘোর রক্ত বর্ণ মেপল গাছের পাতায় বনভূমিকে নাকি বহ্নিমান মনে হয়। আবার শীতে যখন বরফ পড়ে তখন বরফের ভারে পাইনের

ডালগুলি নুয়ে পড়ে আর অন্যান্য নিষ্পত্র স্নিক্ত গাছের ডাল পালায় বরফ তুলোর মত লেগে থাকে,—নীচের জমি তখন বরফে চাপা পড়ে অদৃশ্য।

আবার মধ্য এপ্রিলে যখন বরফ গলে যায়—তখন মাটির বুকে আর গাছ পালায় সবুজের প্লাবন ; পিউনি ফুলের গাছে ডালে ডালে পাতা ও কুঁড়ির ভিড় ; ১০/১২ দিনের মধ্যেই স্থলপদ্মের মত বড় বড় 'পিউনি' ফুলে বাগান তখন আলো হয়ে থাকে।

মিনিসোটাকে এরা গর্ব করে বলেন 'দশহাজার হ্রদের দেশ'। যে হারে পায়ে পায়ে হ্রদ বা হ্রদাণু পড়ছে—তাতে সংখ্যায় দশহাজার হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। আমাদের 'সিডার রিজ' এলাকায়ই ত ছোট ও মাঝারি আয়তনের বেশ কয়েকটা হ্রদ রয়েছে।

এখন এখানে গ্রীষ্মকাল, আঁধার হতে হতে রাত ন'টা বেজে যায়। সচেতন আবালবৃদ্ধবনিতা এবং শৌখিন মৎস্যশিকারীদের ভিড়। হামেসাই চোখে পড়বে—মধ্য হ্রদে গিয়ে মাছ ধরবেন বলে উৎসাহী ব্যক্তিরা মোটরের পেছনে করে নৌকা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার সীমিত বসনে অথবা শ্রেফ খালি গায়ে নরনারী বালবৃদ্ধ হ্রদের তীরে তীরে দৌড়াচ্ছেন এ দৃশ্যও দেখতে পাবে। মিতাদের নতুন বাড়ী অমনি একটা হ্রদের তীরে,—নাম 'রাইসল লেক' যদিও ধারে কাছে ধানের সাক্ষাৎ কোথাও পেলাম না।

এক রবিবার এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর বাড়ীর কাছেই এখানকার 'হিন্দুমন্দির'। এই সুদূর বিদেশ বিভূঁয়ে হিন্দুমন্দির। দেখবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাই ঠিক হল মন্দিরটা দেখে তারপরে তাঁর বাড়ী যাব। একটা পুরাণো গির্জ্জার কাছে এসে পিন্টু বল্ল—"এটাই আমাদের মন্দির।" এই পুরাণো গির্জ্জাটাকে কিনে নিয়ে এখানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সবাই নেমে পড়লাম এবং দরজায় জুতো খুলে রেখে ভিতরে ঢুকে

পড়লাম। পুরানো গির্জ্জাটির সৎসামান্য পরিবর্তন করে মন্দিরের ভাব আনা হয়েছে। উপাসনার বেদীতে নানা দেব-দেবীর ছবি ও মূর্ত্তি সাজান ; শিব, দুর্গা, গণেশ, মহালক্ষী, প্রভৃতি সবাই উপস্থিত তার ঠিক নীচেই আর একটা অপেক্ষাকৃত নীচু বেদী। তাতে কার্পেট পাতা, এক পাশে একটা 'মাইক', হারমোনিয়াম আর এক পাশে রয়েছে নানা ধর্মগ্রন্থ। তার মধ্যে গীতা, তুলসীদাসের "রাম চরিতমানস" আর কিছু ইংরেজী বই ; বাংলা বই একটিও নেই।

এবার পাশের ঘরটাতে কি আছে দেখতে গিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম ; ওখানে যে বিছানা পাতা, জামা কাপড় ঝুলছে, বোধহয় যে ভদ্রলোক জায়গাটা দেখাশোনা করেন,—তাঁর আস্তানা।

একটা সিঁড়ি নীচের দিকে চলে গিয়েছে দেখে সিঁড়ি বেয়ে সবাই নীচে নেমে এলাম গিয়ে দেখি—সেখানে জনা দশ ভারতীয় নরনারী প্রসাদ পাচ্ছেন একটা জায়গায় সন্দেশ, পুরী, ঘি-ভাত, তরকারী, হালুয়া প্রভৃতি থরে থরে সাজান ; পাশে একগুচ্ছ কাগজের প্লেট গ্লাশ আর চামচ রাখা। একজন শক্তসমর্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। সবাই মিলে প্রসাদ পেলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। তিনি এখানকার প্রাচীনতম ভারতীয় বাসিন্দা ; প্রায় ৩০/৩৫ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর প্রচেষ্টাতেই এই মন্দির স্থাপন সম্ভব হয়েছে। পুণের চিৎ-পবন ব্রাহ্মণ হলেও এককালে কোলকাতায় ছিলেন বলে এখনো বাংলা বেশ ভালই বলতে পারেন। কথায় কথায় প্রকাশ পেল আমরা মহারাষ্ট্রের ঔরংগাবাদে বছর চার ছিলাম এবং কন্যা মিতা মারাঠী ভাষায় এককালে ভালই কথাবার্তা বলতে পারত। একথা শুনে ভদ্রলোকের স্ত্রী ত পরম উৎসাহে মিতার সঙ্গে আগাগোড়াই মারাঠী ভাষায় কথা বলে গেলেন এবং মন্দিরে আবার আসার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন।

বিদেশে 'হিন্দুমন্দির' দর্শন এবং সেখানে আন্তরিক আদর আপ্যায়ন পেয়ে আমাদের খুব ভালই লেগেছিল।

এদিকে ডাঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে যেতে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। তাই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শহরের 'ডাউন টাউন' অর্থাৎ ব্যবসায় প্রধান অঞ্চলে উপস্থিত হলাম। বাড়ীঘর এখানে প্রচুর যদিও ঘিঞ্জি নয় মোটেই। রাস্তায় দু'পাশে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী।

প্রত্যেক বাড়ীর সামনেই সবুজ লন, ফুলের বাগান, সেখানে সযত্নে লাগান নানা প্রজাতির দামী দামী পাইন ও মেপল গাছ। প্রতি গৃহেই গ্যারেজ; গাড়ী না থাকলে এখানে জীবন অচল। ডাক পিয়ন এখানে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চিঠি বিলি করে না, করে গাড়ী চড়ে এবং গাড়ী থেকে না নেমে তাদের সুবিধার জন্য রাস্তার পাশে ৩/৪ ফিট উঁচু কাঠের বা লোহার দণ্ডের উপর প্রায় দুই ফিট লম্বা চিঠির বাক্স বসান। খবরের কাগজ বিলির জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা। চিঠি ডাকে দিতে কোথাও যাবার দরকার নেই: চিঠির বাক্সে চিঠি রেখে ঐ বাক্সে লাগান একটা ছোট্ট ডাণ্ডাকে উঁচু করে রাখতে হয়। ওটা দেখেই পিয়ন বুঝতে পারে যে ডাকে দেবার চিঠি এ বাক্সে রাখা আছে এবং চিঠি বিলির সময় সে ঐসব চিঠি ডাকে দেবার জন্য নিয়ে যায়।

ডাঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীর ছায়াঘন লনে একটা মেপল গাছের নীচে গাড়ীটা রেখে আমরা তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম এবং অচিরে যথাযথ আপ্যায়ন শুরু হয়ে গেল। কন্যা ও জামাতার হিউষ্টোনস্থ এক বন্ধুর মাধ্যমে উভয় পরিবারের আলাপ এবং সেই সূত্রেই আজকের এই নিমন্ত্রণ।

সঞ্জীববাবু ঠিকই বলেছিলেন—বিদেশে বাঙ্গালীমাত্রেই সজ্জন। আলাপ অচিরেই জমে গেল! ভদ্রলোকের কথায় একটু পদ্মাপাড়ের গন্ধ পেয়ে জিজ্ঞাসাই করে ফেল্লাম—দেশ কোথায় ছিল। ঠিক অনুমান

তাঁরা পদ্মাপাড়েরই মানুষ বটে। তাঁর বাবার লেখাপড়া খেলাধূলা সব আমারই মত কুমিল্লাতেই হয়েছে। তাঁর বাবার দেয়ালে টাঙ্গান ছবি দেখেই আমার মনে হচ্ছিল—চেনা চেনা মুখ। তাঁর মামার বাড়ীও কোলকাতায়—আমাদের বাড়ীর কাছেই এবং তিনিও আমার অপরিচিত নন। আরও অবাক হলাম এই জেনে যে আমার আবাল্য সুহৃদ দীর্ঘদিনের স্কুল ও কলেজের সহপাঠী সুশীল তাঁর জ্ঞাতি ভাই। আশ্চর্য্য হলাম খুব আর তেমনি আনন্দ পেলাম। এ দেশের 'কৃরিৎকর্ম্মা' ভাবটা বোধ হয় একটু ছোঁয়াচে। তাই দেখছি গাঙ্গুলী গৃহিণী ছেলে মেয়ে একটু বড় হওয়া মাত্র পড়াশুনায় লেগে গেছেন;—গণিতে 'রিসার্চ' করছেন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে। জেনে খুবই ভাল লাগল।

খাওয়া দাওয়ার পর এখানকার বিখ্যাত বিজ্ঞান-সংগ্রহশালা (Science Musium) দেখতে যাচ্ছি শুনে ডাঃ গাঙ্গুলী বাতলে দিলেন সেখানকার স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক সিনেমাটা (Omni theater) যেন অবশ্যই দেখি। যথাসময়ে বিদায় নিয়ে আমরা বিজ্ঞান-সংগ্রহশালার দিকে রওয়ানা হলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছেও গেলাম।

বিরাট সৌধ,—সামনেই লোহা দিয়ে তৈরী এক বিরাট প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটির মত প্রাণী। ওখানে দাঁড়িয়ে খানকয় ছবি তোলা হল। টিকিট কিনে নীচের তলায় সংরক্ষিত নানা দ্রষ্টব্য দেখতে লাগলাম। এখানে নানা জীব-জন্তুর ষ্টাফ (Stuff) করা মূর্ত্তি, নানা মাছ ও জলজ কীটের ফসিল প্রভৃতি রয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় নাম ধাম পরিচয় বিশদভাবে দেওয়া। একটা বিশাল বাদামী রঙের ভালুক দেখলাম এখানে!—কী বিরাট তার চেহারা। এ অঞ্চলের হিংস্রতম জন্তু নাকি এটা, খাওয়ার ব্যাপারে সর্বভুক।

এবার এক তলার দেখা শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে দু'তলায় উঠলাম সবাই। এক জায়গায় নানা প্রকারের স্থানীয় শস্যাদি—যথা ভূট্টা, গম, ডাল প্রভৃতির নমুনা রাখা হয়েছে। মাটির উপরের এসব ফসল ছাড়াও মাটির নীচের ফসল—এখানকার মাটির তলায় বা এখানকার পাহাড়ের

কন্দরে যে সব খনিজ দ্রব্যাদি ও মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়—তাদের নাম ধাম ইত্যাদিও তেমনি রাখা আছে।

আর রয়েছে "Mending of a broken heart"। না- না, এটা কোনও হতাশ প্রেমিককে সান্ত্বনা দেওয়া টেওয়ার ব্যাপার নয়,—হৃদয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দান মাত্র। কি ভাবে হার্ট কাজ করে,—তার বিরাট আকারের নমুনা—যাতে রক্ত চলাচল পদ্ধতি ও ক্রম, রক্তের বিশুদ্ধিকরণ, হার্টের ভিতরকার নানা যন্ত্রপাতি ও তাদের কাজ কর্মের পদ্ধতি-সব কিছুই বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়েছে সঙ্গে রয়েছে কি কি খেলে হৃদরোগ বাড়ে বা কমে—তার দীর্ঘ বিবরণ।

আরও ছিল "Wolves and human"—'নেকড়ে ও মানুষ' এই সম্বন্ধে নানা দ্রষ্টব্য। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে যেমন আমাদের একটা চাপা গর্ববোধ রয়েছে, এদেরও তেমনি রয়েছে নেকড়ের পাল নিয়ে অহঙ্কারজনক ন্যাকামি। কাঁচ দিয়ে ঘেরা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নানা বয়সের—নানা আকারের নেকড়েদের 'ষ্টাফ' করা মূর্ত্তি রাখা আছে। তাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্বাবস্থার মূর্ত্তিও এখানে রাখা আছে। দেখান হয়েছে তাদের আচার ব্যবহার, সংঘবদ্ধ শিকার কৌশল ইত্যাদি প্রতি প্রকোষ্ঠের জন্য আলাদা আলাদা 'সুইচ' টিপলেই ওখানে প্রদর্শিত নেকড়েদের ডাকের নমুনা শুনতে পাওয়া যাবে মেয়ে মদ্দা, ছেলে বুড়োর কা ভিড়টাই না সেখানে!

এবার এলাম 'মায়া' সভ্যতার প্রদর্শনীটি দেখতে। আসামে যেমন বাঁশের দরমা বা কাঠির উপর মাটি গোবর লেপে দেয়াল গড়া হয়ে থাকে—এখানেও অবিকল সেই রকমই দেখছি;-ঘরের চালও তেমনি খড়ে ছাওয়া। আমাদের দেশের নানা আকারের জল ধরে রাখার প্রাচীন ধরণের পাত্রও দেখতে পেলাম। মশলা বাটার শিলনোড়া ও অবিকল আমাদের দেশেরই মত আবার দক্ষিণ ভারতে যেমন 'ইডলি ধোসা বানাবার জন্য পাথরের গর্তে পাথরের একটা গোল লম্বা ডাণ্ডা

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাল ডাল বাটার ব্যবস্থা এদেরও দেখছি ঠিক তেমনিটিই রয়েছে। এত আশ্চর্য্যজনক মিল এল কোথা থেকে। দেখছি—আমাদের গ্রাম্য তাঁতীদের সুতো গুটিয়ে রাখার নাটাইএর মত নাটাই একই কাজে এরা ব্যবহার করতেন। গাঁয়ে গঞ্জে খাটিয়ার তলায় চপ্পল, খড়ম ইত্যাদি রাখা আমাদের অভ্যাস। তাদেরও দেখছি তেমনি দড়ির খাটিয়া, তেমনি চপ্পল, তেমনি খড়ম, তেমনি অভ্যাস। ওদের চপ্পল আর আমাদের মারাঠী কোলাপুরী চামড়ার চপ্পলে কোনো তফাৎ নেই। এদের ভাস্কর্য্য দেখলে মনে হয়—নেপাল ও ভুটানের ধারার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল। মনে পড়ে ছেলেবেলাতেও তু'দেশের ভাস্কর্য্যের ছবি দেখে একই কথা মনে হত আর একই রকম অবাক হতাম।

আজকাল অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে পৃথিবীর স্থলভাগ একদা একসঙ্গেই ছিল। ধীরে ধীরে সেই সংযুক্ত স্থলভাগ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে কালক্রমে নানা মহাদেশ ও নানা মহাসাগরের উৎপত্তি হয়েছে। তারই জন্য হয়ত এশিয়ার জীবজন্তু ও তাদের পেছনে পেছনে এশিয়ার মানুষ সাইবেরিয়া পেরিয়ে আলাস্কা হয়ে সারা উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিল

ভূতত্ত্বজ্ঞদের মতে ৩০ কোটি বৎসর আগে Panega যুগে পৃথিবীর স্থলভাগ ছিল একটাই। তাঁদের ধারণা ২০ কোটি বৎসর আগেকার Mesozoic যুগে, যখন বিরাট বিরাট ডায়নোসোররা যত্রতত্র দাপটে বেড়াচ্ছে—তখনই স্থলভাগের সেই 'একান্নবর্ত্তী পরিবারে' ভাঙ্গন ধরেছিল। ক্রমে পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন স্থলভাগ বৎসরে ২ থেকে ৬ সেন্টি-মিটার সরে সরে গিয়ে ক্রমে ক্রমে অতলান্ত আটলান্টিক মহাসাগরের জন্ম হল সমুদ্রের তলদেশের বিস্তারের ফলে জন্ম হল Laurasiaর সংযুক্ত অঞ্চলের এবং Gondwana land এর দক্ষিণ অঞ্চলের। ভারতীয় অন্তরীপ তখন নাকি এই দক্ষিণাঞ্চলেও গণ্ডওয়ানাল্যাণ্ডের একটি অংশ মাত্র ছিল। অতি ধীরে অষ্ট্রেলিয়ার মূলভূমি থেকে ভারতীয় উপদ্বীপটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁদের ধারণা ৬০০ কোটি বৎসর আগেকার Paleoccne যুগে ভারতবর্ষ ছিল মহাসমুদ্রে ভাসমান

এশিয়া অভিসারী একটি দ্বীপ মাত্র। এই দুই খণ্ডের মহামিলনে যে মহাপ্রলয় কাণ্ড হয়েছিল—তাতেই জন্ম নিল হিমালয় পর্বত যা নাকি বিশ্বের কনিষ্ঠতম হলেও উচ্চতম শিখর বিশিষ্ট পর্বতমালা।

স্বপ্নবৎ মনে হলেও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে বহু জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান হয়ত সম্ভব। পৃথিবীর বুকে পর্য্যায়ক্রমে তুষার যুগ ও উষ্ণ যুগ এসেছে। ফলে এক একটা তৃণবহুল বৃক্ষলতা সমৃদ্ধ অঞ্চল হয়ত মরুভূমি হয়ে গেল বা বরফে ঢাকা পড়ে গেল। বাধ্য হয়ে, নিতান্ত প্রাণ রক্ষার তাগিদে, হয়ত ফলমূল তৃণভোজী জীবজন্তু এবং সেই সঙ্গে মানুষকেও প্রাণের দায়ে খাদ্যানুসন্ধানে হয়ত দূরদূরান্ত পেরিয়ে দেশ-ত্যাগী হতে হয়েছিল। স্থলভাগ ত অনেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত ছিল। তাই মধ্য এশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে আলাস্কা হয়ে আমেরিকার মধ্য বা দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত পৌছান দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য ছিল না, এবং এটাও মনে রাখতে হবে—বহু যুগ ধরে এটা হয়েছে—একদিনে নয়। তাই দেখতে পাচ্ছি ডায়নোসোরের ফসিল যেমন রয়েছে সাইবেরিয়ায় ও চীনে তেমনি রয়েছে উত্তর আমেরিকার কলোরোডো নদীর উপত্যকায়। চতুঃস্কান চোয়ালযুক্ত কৃষ্ণ অকুঞ্চিতকেশী ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের অনুন্নত নাসিকার দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার আদিবাসীর সঙ্গে চেহারায়, ভাস্কর্য্যে শিল্পকলায় আমাদের সিকিম ভূটান নেপাল অঞ্চলের লোকদের তাই হয়ত এত মিল।

অধুনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাবিদ ও পণ্ডিতেরা নানা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই জটিল সমস্যা সমাধানে উত্তরোত্তর এগিয়ে চলেছেন।

আজকাল অনেকেই জানে না যে কলম্বাসের তথাকথিত 'আমেরিকা আবিষ্কার' এর বহু পূর্ব থেকেই চীন, জাপান ও নরওয়ে থেকে দুঃসাহসী অভিযাত্রীদলের যাতায়াত উত্তর ও মধ্য আমেরিকার ভূভাগে ছিল। কোনো কোনো প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের ধারণা মধ্য ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসী এবং রেডইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়

সভ্যতার লেনদেন ছিল। আপাততঃ বক্তৃতার এখানেই ইতি টানছি, কারণ এসব বিষয়ের কোনো কিছুই তর্কাতীত নয়।

এবার তোমাকে শুনাব How-I হাওয়াই কেমন দেখলাম। তাহলে তোমাকে আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে মনে মনে অম্‌নি থিয়েটারে—যেখান থেকে অমনি অমনি হাওয়াই দ্বীপ দেখতে পাবে—একেবারে চাক্ষুষ দেখার মতনই।

সবাই মিলে অম্‌নি থিয়েটারে গিয়ে বসা হল ; রীতিমত রেস্ত খসিয়ে টিকিট কেটে।—অমনি নয়, তা হয়ও না এদেশে।

উপরে আকাশের মত অর্দ্ধ গোলাকার ছাদ. নীচে গ্যালারী যেমন সার্কাসে থাকে। শুনেছিলাম ত্রিমাত্রিকত্বটা উঁচু থেকে দেখলেই বেশী ভালভাবে প্রকট হয়। তাই বেশ উচ্চ দেখে আসন খুঁজে নিয়ে সবাই বসেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্পেস্ থিয়েটার' বলে খ্যাত 'এল, ম্যাকনাইট থ্রি এম অম্নিথিয়েটার' আরম্ভ হয়ে গেল। উপরের অর্দ্ধবৃত্তাকার ছাদের সবটা জুড়ে সিনেমার পটভূমি, তাতে যে ছবি দেখা যাচ্ছে তা যেন একেবারে জীবন্ত! শব্দও যেন নানা দিক থেকে আসছে। সব কিছু মিলে এক আশ্চর্য্য বাস্তবতুল্য পরিবেশ।

সে দিন দেখান হচ্ছিল—হাওয়াই দ্বীপ ও তার প্রাচীন অধিবাসীদের জীবনধারার ক্রমবিকাশ। চোখের সামনে উত্তাল তরঙ্গময় অশান্ত প্রশান্ত মহাসাগরের রূপ জেগে উঠল। তাতে বাত্যা ও তরঙ্গতাড়িত একটি বৃহৎ পালতোলা নৌকায় আদিম অধিবাসীদের নূতন দ্বীপের অনুসন্ধানের দৃশ্য। সমুদ্রের কল্লোল, ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রগর্ভ মেঘের ঘনঘন বিদ্যুৎ স্ফুরণ। তারই মধ্যে আদিম অধিবাসীদের সামান্য পালতোলা নৌকায় দুঃসাহসী অভিযান,—যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। তারই মধ্যে বৃদ্ধ সর্দ্দারের আকাশে উড়ন্ত সমুদ্রের পাখী-দেখে নিকটেই স্থলভূমির অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উল্লাস জ্ঞাপন, আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাত্রীদের স-উল্লাস ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও প্রার্থনা,—ধীরে ধীরে নৌকার শিলাময় সৈকতের সন্নিকটে

ভিড়া,—পাহাড়ের খাড়া সানুদেশের পাথরের গায় সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়া আর কলোচ্ছাস ;—মনে হচ্ছিল দূর থেকে নয়,—ঐ নৌকার উপরে বসেই যেন দেখছি। ছবিতে ঢেউ-এর দোলায় নৌকা দুলছিল, আর মনে হচ্ছিল—আমরা যেন ঐ নৌকায় বসে দুলছি, এক্ষুণি মাথা ঘুরে পড়ে না যাই। তাদের তীরে অবতরণ, নূতন করে উপনিবেশ গড়ে তুলে ঘরকন্না, জীবনযুদ্ধ, উত্তাল সমুদ্র আর দুর্গম পাহাড়ের সঙ্গে অক্লান্ত সংগ্রাম দর্শকদের চোখের সামনে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

গৃহিনী বল্লেন—"ওখানে না গিয়েই ত হাওয়াই দ্বীপ দেখা হয়ে গেল। ওখানে গেলেই কি-এর থেকে বেশী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওখানকার জল জঙ্গল গাছপালা সমুদ্র আর ওদের জীবনযাত্রা দেখতে পেতাম।"

হক্ কথা,—আশা করি তুমিও মানবে।

দর্শনান্তে খুসী মনে সবাই বাড়ী ফিরলাম ;—আজ দেখবার মত জিনিষ দেখা হল বটে।



[মিনিয়াপোলিস-বেলসাহেবের নামের বিভিন্ন পশুপক্ষী-
দের সংগ্রহশালা এবং চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শন।]

মেপলগ্রোভ, মিনিয়াপোলিস্

এখানকার বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ইত্যাদি দেখার পর আমার একটু আলসেমি করছিল। দু'দিন যেতে না যেতেই মিতার তাড়া শুরু হয়ে গেল—"আগে ত এখানকার যা যা দ্রষ্টব্য দেখে নাও,—তার পর না হয় যত খুসী বিশ্রাম করো"—অর্থাৎ কিনা আমাদের গ্রাম্য ভাষায়—

"গাং পার অইয়া তামুক খাও" !

অগত্যা এক ছুটির দিনে খাওয়া দাওয়ার পর পিণ্টু আমাদের "বেল মিউজয়াম অফ নেচারেল হিষ্টরী" দেখাতে নিয়ে চল্ল।

সেদিন আকাশের মুখভার,—বেরুবার একটু আগে থেকেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তবে এখানকার বৃষ্টির তেমন দম নেই;—একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে না—

"অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে !
দাম্পত্য কলহেশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ।।"

—অনেকটা সেই রকম ব্যাপার।

মিনেসোটার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যখন ঢুকলাম তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঐটুকু বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেই সবাই দ্রুত পদে মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লাম।

এই মিউজিয়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য পঠন পাঠন। স্থানে স্থানে কাঁচের আবরণের আড়ালে জীবজন্তু কীটপতঙ্গ নানা স্থানীয় পাখী ইত্যাদি 'ষ্টাফ' করে রাখা আছে। দেখলে মনে হয় যেন জীবন্ত। নীচে বিশদ

বিবরণ দেওয়া—কি নাম, কি গোত্র, বসতিকোত্র, কি চরিত্র, কি স্বভাব ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বন্য প্রাণীদের—স্থল,জল, উভচর নির্বিশেষে স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্রের অবিকল পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। চিরতুষার অঞ্চলের একাধিক প্রজাতির বল্গা হরিণের নমুনা এখানে আছে। পাইন অরণ্য-চারী হরিণদের সঙ্গে তাদের কতই না তফাৎ। বেশ যত্ন করে রাখা একটা বড় আকারের দাঁড়কাক এখানে দেখলাম। সত্য মিথ্যে জানি না—কাক নাকি এ দেশে পোষে। তা দুষ্প্রাপ্য হলেই মহার্ঘ্য হয়। এই সাদার দেশে কাল কাক কোথায়! তাই কদাচ দেখলেই রাজসম্মান বনবেড়াল, নেকড়ে, শিয়াল, নানা রকমের পাখী, নানা প্রজাতির কাঠ-বিড়াল,—নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য পাথর যা এখানকার নানা অঞ্চলে



বা নদীগর্ভে পাওয়া যায়—তাদের স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সযত্নে রাখা হয়েছে। কাঁচের আবরণের ভিতরে গাছপালা—আমাদের শাপলার মত জলজ লতা,—পেছনে বন, আকাশ, অক্টোবরের 'ফল'এর সময়কার বনানী বা জানুয়ারীর বরফে ঢাকা রিক্ত অরণ্যানী—সবই যেন জীবন্ত,—দূর থেকে দেখলে সত্য বলে ভ্রম হয়।

খুব ভাল লাগল,—দেখার সঙ্গে শেখা—আর ফাও বিমলানন্দ।

খুসী মনে বাইরে বেরিয়ে দেখি—বৃষ্টিধোয়া নির্মেঘ আকাশ ও

খুশীতে নির্মল নীল। মিতার আবার অফুরন্ত উৎসাহ। বল্ল—"বৃষ্টি যখন নেই—চল এই বেলা 'মিনিয়াপোলিস ইন্‌ষ্টিটিউট অফ আর্টস' দেখে আসি।"—অতি উত্তম প্রস্তাব। সবাই গাড়ীতে উঠে বসলাম।

এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে ঘুরে গাড়ী ইন্‌ষ্টিটিউটে পৌঁছে গেলে আমরাও সেখানে টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম।

এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারী নয়,—স্থানীয় বিত্তবানদের মুক্ত হস্তের দানে এটার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। তা হলেও এ সংগ্রহশালা নিতান্ত ছোট নয়, গ্রীক, ইটালিয়ান, রেনেসাঁর সময়ের ভাস্কর্য্য ও চিত্র, তৎসহ চীনা, জাপানী, ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও ছবির নমুনা এখানে রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে প্রচুর উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী-দের সভ্যতার নমুনা, তাদের ব্যবহার্য্য নানা ধরণের জিনিষপত্র, কাঁথা, কম্বল, সতরঞ্চি, মাটির পুতুল, অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির বিরাট সংগ্রহ। আবার এখানে মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন—যেমন শিলালিপি শবাধার, মমী, মমীর এক্সরে ফটো, রাজারানীদের ব্যবহৃত সোনার অলঙ্কার ইত্যাদিও রয়েছে। চীনের প্রাচীন সুংরাজাদের আমলের চীনামাটির রকমারি কাজ করা পাত্রও কিছু কিছু আছে। সুতরাং এই সংগ্রহশালাকে নেহাৎ হেলাফেলার বলা চলে না।

ঢুকেই চোখ পড়ল দু'টি বৃহদায়তনের চৈনিক মূর্ত্তি, খুব মসৃণ ও যত্ন করে রূপায়িত। খুবই সুন্দর। তার অনতিদূরেই দোতলার বারান্দায় একেবারে অন্যশৈলীর—গ্রাইকোরোমান ভাস্কর্য্যের অতি সুন্দর একটি শ্বেতমর্মর নিদর্শন। এ মূর্ত্তিগুলির বহির্জগতে খুব নাম আছে কিনা জানি না,—তবে সর্বাংশে সে খ্যাতির যোগ্য বলেই মনে হল। কয়েকটি গ্রীক রোমান ধারার রমণীমূর্ত্তি দেখলাম, বাস্তবিকই রমণীয়, বিখ্যাত 'ভেনাস'এর মূর্ত্তি থেকে—আমার ত মনে হল—কোন অংশেই কম নয়—লাবণ্যে ত নয়ই।

এবার ঢুকলাম রং এর মহলে—কোনো বিলাসীর রংমহলে নয়—ছবির মহলে—রং আর তুলি প্রয়োগে সুন্দরের পূজারী শিল্পীরা যেখানে আপনার মনের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে অভিনব নন্দনলোকের সৃষ্টি করেছেন।

এখানে তেল রং এ আঁকা বহু প্রতিকৃতি রয়েছে,—দেখলেই মনে হয় সার্থক সৃষ্টি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন ফুটে উঠেছে। এগুলি সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে আঁকা। মধ্যযুগীয় ধর্মমূলক প্রাচীন ছবিও রয়েছে দু'চার খানা. তাদের কয়েকটি কাঠের ফলকের উপর আঁকা, রং মাঝে মাঝে ফেটে যাচ্ছে।

এই দানভিত্তিক সংগ্রহশালায় দ্যা ভিন্সি, র‍্যাফেল, ভেনডাইক, প্রভৃতি বিশ্বের বরেণ্য শিল্পীদের আঁকা ছবি নেই,—থাকাও সম্ভবও নয় আকাশ ছোঁয়া দামের জন্য। তবে যা আছে তার গুণগত মান যথেষ্ট উচ্চ, বহু দামী সংগ্রহশালা এগুলি পেলে পরম সমাদরে গ্রহণ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ভারতীয় চিত্র এখানে একটিও নেই, রয়েছে প্রাচীন কয়েকটি চীনা ছবি, কাগজের ও রেশমের কাপড়ের উপর আঁকা। দেখে মুগ্ধ হলাম। বিষয়বস্তু কিন্তু খুবই সাধারণ,—একটা বাঁশের কাণ্ড ও দু'একটা কঞ্চি, কয়েকটি বাঁশ পাতা,—ব্যাস আর কিছু নয়। কেবল কাল রং দিয়ে আঁকা। কিন্তু কী মুন্সীয়ানা! কী নরম তুলির কাজ। কী কম্পো-জিশান অর্থাৎ কোন জায়গায় কোন জিনিষটি থাকবে তার সঠিক নির্বাচন। কত অল্পের মধ্যে কত বেশী প্রকাশ। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা, তাই এত সৌন্দর্য্যজ্ঞান, এত পরিমাণবোধ এত সংযম। জাপানী তুলিও খুব 'এলেমদার'। তাদের আঁকা ফুল যেন হাত লাগলে পাপড়ি ঝরে পড়বে,—ঘ্রাণ নিলে যেন নাকে গন্ধ পাব। তবুও মানতে হয়—জলের রং এর প্রয়োগে চিত্রশিল্পের আদি গুরু চীনারাই।

প্রাচীন চীনা রাজাদের আমলের দামী ওপেল পাথরের কিছু বাসন পত্র, ফুলদানী ও ভাস্কর্য্য দেখে মুগ্ধ হলাম।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নমুনা এ সংগ্রহশালায় ২/৩টির বেশী নেই। একটি মাঝারি আকারের তাঞ্জোরের নটরাজ মূর্ত্তি ও একটি স-লক্ষ্মী বিষ্ণুমূর্তি দেখলাম। আর দেখলাম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত একটি ধ্যানী

বুদ্ধের মূর্তি। এর মাধুর্য্য ও মহিমা অন্যদের মত বস্তু বা প্রাণস্তরের নয়, এমনকি মনের স্তরেরও নয়; এর সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও মহিমা এসেছে উর্দ্ধের অধ্যাত্মলোক থেকে। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দেখলে মন আপনি শান্ত ও নীরব হয়ে আসে।

এবার আমরা যাচ্ছি 'মায়া সভ্যতা'র নমুনা দেখতে-মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের শিল্প সংগ্রহশালায়। বহুপ্রাচীন কালের সুপ্রাচীন আমেরিকার অধুনালুপ্ত সভ্যতা এটা-বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের প্রত্নতাত্ত্বিকদের গভীর গবেষণার বিষয়।

এদের ব্যবহৃত পোড়ামাটির হাঁড়ি, জলের কুজো, পোড়ামাটির মূর্তি ইত্যাদি দেখলাম। সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করল মেক্সিকোর প্রাচীন মাটির মূর্তি-হয়ত মূর্তি না বলে পুতুল বলাই ঠিক হবে। গঠন-রীতি খুবই সরল; ছেলে মেয়ে বুড়োবুড়ি নানা ভঙ্গিতে বসে দাঁড়িয়ে। সবারই একেবারে জীবন্ত মুখের ভাব। চোখের পুতলির জায়গায় ত দুটো ফুটো মাত্র; তাতেই কী জীবন্ত চোখের তারা! যেন কথা কইছে।

উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার অনেক নিদর্শন এখানে আছে। সেটাই স্বাভাবিক, স্থানীয় বলে সংগ্রহ করার সুযোগ সুবিধাও অত্যন্ত বেশী। তাদেরও মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীদের বোনা নানা ধরণের কম্বল, সতরঞ্চি প্রভৃতি, নানা দেবদেবী ও নরনারীর মূর্তি হাড় ও কাঠে খোদাই; বাদ্য যন্ত্র, অস্ত্র শস্ত্র, বরফান মুল্লুকে চলার উপযোগী নৌকার মত গঠনের কাঠের জুতো, হাড়ে গড়া অস্ত্র শস্ত্র,—অনেক কিছুর অঢেল সংগ্রহ এখানে।

দেখা শেষ হলে সবাই এবার চল্লাম আফ্রিকার সংগ্রহশালায়। আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করা নানা আকারের নানা বিচিত্র জিনিষ দিয়ে তৈরী মুখোস, শিরস্ত্রাণ, অস্ত্র শস্ত্র, কাঠের ও হাড়ের তৈরী নানা মূর্তি এখানে রয়েছে; তাদের কিছুটা দেব-দেবী কিছুটা প্রতীকী—কিছুটা বা জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত। মোটা হাতে কাঠ খোদাই করে পশুর লোম দিয়ে এমনকি কখনো কখনো মানুষের চুল ব্যবহার করে এরা

মূর্তি গড়েছে। নানা ধরণের প্রাগৈতিহাসিক পর্য্যায়ের বাদ্যযন্ত্র, পাথর বা ধাতু দিয়ে তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের নমুনাও দেখতে পেলাম। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে সংগৃহীত দর্শনীয় বস্তু এখানে প্রচুর। এখান কার আফ্রিকা থেকে আমদানী ভাস্কর্য্যের নমুনা দেখে অত্যাধুনিক sureal (ছার real ?) চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যের কথা মনে হবেই।

পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা এই শৈলী আধুনিক শিল্পীরা কেন যে গ্রহণ করছেন বোঝাই মুস্কিল। আফ্রিকার আদিম যুগের নিতান্ত অপরিণত অপরিশীলিত চিত্রকলার সঙ্গে আধুনিক Surreal চিত্রকলার পার্থক্য খুব বেশী নয়। অপরিশীলিত অসংস্কৃত শিল্পকলার অনুকরণ কী করে সংস্কৃতিবান শিল্পীর পক্ষে সম্ভব ! প্রতীচ্যের শিল্পীরা প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নূতন পন্থা খুঁজছেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই ! অজন্তা ইলোরার ভারতবর্ষ কবে থেকেই প্রকৃতির অন্ধ অনুকৃতি বর্জ্জন করে রূপ ও রেখার সরলীকরণ করে শিল্পকে অন্তর্মুখী করার প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু নৃত্যকলা, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে বহু শতাব্দীর অনুশীলন ও পরিশীলনের ফল পরিত্যাগ করে সহসা প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার দিকে এই হঠকারী পদক্ষেপের কারণ সহজবোধ্য নয় ! অতি প্রত্যক্ষ চেতনার স্তর যদি পর্য্যাপ্ত না হয়ে থাকে তবে অবচেতন অভিসারী কেন হতে যাব ? অতিচেতনের কী অপরাধ ? তবে এটা সহজবোধ্য যে অধোগতির পথ প্রশস্ত ও সুগম, ঊর্দ্ধারোহনের পথে চলতে হলে চাই জ্বলন্ত অভীপ্সা আর নিরলস প্রচেষ্টা—যা সর্বদাই সুদুর্লভ। যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ ও সত্যদৃষ্টি-সম্পন্ন তাঁরা বলেছেন এটা যুগসন্ধি। এখন অবচেতনের স্তর থেকে অশুভ শক্তিরা যেমন উঠে এসে প্রবল ভাবে মানব চৈতন্যকে অধিকার করছে—তেমনি অতিচেতনের স্তর থেকেও প্রবলতর শুভ শক্তি নেমে এসেছে অশুভ শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করতে। মানুষ নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে শুভ বা অশুভ শক্তিকে ঘরে ডেকে আনছে। অবচেতনকে গ্রহণ করার মূলে এই সত্যই নিহিত। অবচেতনে অবগাহনের এই অত্যাধুনিক ফ্যাসান অবশ্যই সাময়িক মাত্র,—ভাবী কালের ইতিহাসে এরা কখনো স্থায়ী আসন পেতে পারে না। রুচিবিকৃতি এই সর্পিল চক্রের (Spiral) নিম্নতম বিন্দু স্পর্শ করেছে বলেই ঊর্দ্ধারোহণ অবশ্য-

স্তাবী। যাক—আমার ব্যক্তিগত মতামতে কিছু আসে যায় না। পৃথিবী তার আপন অলজ্ঘ্য নিয়মেই চলবে—

'যতদিন নাহি জাগে কল্কি অবতার।'

আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ প্রান্তের শিল্পকলা সম্ভোগে আর কাজ নেই। এইবার এই মহাদেশের একেবারে উত্তর প্রান্তের মিশরীয় সভ্যতায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সেটা অনেক বেশী তৃপ্তিকর হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাই এখানকার প্রাচীন মিশরীয় পুরা কীর্ত্তির কিছু সংগ্রহ দেখতে সবাই রওয়ানা হলাম।

একটা বিরাট আয়তনের শিলালেখ দেখলাম—৬ × ৪ ফিটের কম নয়। তাতে মিশরের চিত্রভিত্তিক লিপি খোদাই করা, কিন্তু পাঠ উদ্ধারের মত ক্ষমতা আমার নেই। কিছু কাঠ খোদাই ও কিছু প্রস্তর মূর্ত্তি দেখলাম। মূর্ত্তিগুলির সাজসজ্জা দেখে প্রাচীন ভারতীয় সরলীকরণের কথা মনে পড়ে যায়। প্রকট মাংস পেশী দেখাবার প্রচেষ্টা অনুপস্থিত—সুডৌল হাত, পা, সরু, হাটু পর্য্যন্ত কাপড়—উর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন নরনারী উভয়েরই। তবে অলংকরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পীরা ছিলেন অসাধারণ। মন্দিরগাত্রে, স্তম্ভে স্তম্ভে, গোপুরমে, অজন্তার দেয়ালের পদ্ম, শালুক, জলজ লতাপাতায়, ফুলে, পশু পক্ষী দিয়ে বিরচিত নানা অনবদ্য অলঙ্করণে আজও সে প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।

যাক্—মিশর প্রসঙ্গেই ফিরে আসা প্রাসঙ্গিক হবে। তাঁরা মমী রাখতেন চিত্রিত কাষ্ঠ নির্মিত শবাধারে। আবার নানা কাঠের জিনিষ পত্রও তাঁরা মমীর সঙ্গে দিতেন। সেই ঔষধসিক্ত কাঠ আজও প্রায় অবিকৃত। একটি শবাধারে একটি সুরক্ষিত মমী দেখলাম। খোলা হয় নি বটে, তবে তার এক্সরে ফটো পাশে সকলের দর্শনার্থে রাখা আছে। তার পাশে রাখা আছে একটা কাষ্ঠ নির্মিত শবাধার।

খুব ভাল লাগল এই নাতিবৃহৎ সংগ্রহশালাটিকে। পিণ্টুকে বল্লাম —"আজ মন ভরে 'মনপছন্দ' জিনিষ দেখা হল।"
আর নয়—এবার বাড়ী ফেরা যাক্,—কিছুটা মানসিক রোমন্থনেরও ত প্রয়োজন।

[মিনিয়াপোলিসের নিকটস্থ হ্রদ ও
মিন্নেহাহা প্রপাত দর্শন
মেপল গ্রোভ, মিনিয়াপোলিস্

কয়েক দিন যেতে না যেতেই অফিস থেকে এসে পিণ্টু বল্ল "চলুন শহরের আশে পাশের কয়েকটা হ্রদ দেখে আসি।" মিতা ত সঙ্গে সঙ্গে রাজী। আমরা সবাই আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

১৫ মিনিট যেতে না যেতেই আমরা 'ক্যালাউন' হ্রদের তীরে পৌঁছে গেলাম। খোদ শহরের বুকেই এই হ্রদটা ; এটাকে এড়িয়ে কোথাও যাবার জো নেই। ছ'পাশ দিয়ে রাজপথ চলে গেছে। হ্রদের জলে অসংখ্য নৌকা,—পালবিহীন, পালতোলা, যন্ত্রবিহীন, যন্ত্রচালিত—কত বিভিন্ন রকমের। কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ মাছ ধরছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মদ্দা—হাফপ্যাণ্ট পরে খালি গায়ে দৌড়াচ্ছেন ; এদের মধ্যে প্রচুর কাল আমেরিকানও রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে নাকি এখানে স্বাস্থ্য চর্চ্চার হিড়িক পড়েছে। এদের ৬ ফিট লম্বা পেশীবহুল মূর্তি দেখলে ত মনে হয় না স্বাস্থ্য লাভের জন্য এত কষ্ট করার প্রয়োজন এদের কারো আছে।

হ্রদের পাশের দ্বিতীয় রাস্তাটা ধরে আমরা চল্লাম। গাছপালা, ঘরবাড়ী, রাস্তার ছ'পাশে। কিছুক্ষণ পরেই আর একটি হ্রদ চোখে পড়ল,—তার নাম 'হ্যারিয়েট'। শহরের লোকেরা নাকি এখানে প্রায়ই আসে ; মিতারাও কখনো কখনো আসে।

হ্রদটি প্রদক্ষিণ করে দেখা হল। সর্বত্রই একটা মেলার পরিবেশ। অন্নচিন্তা নেই, অন্য চিন্তারও বিশেষ প্রয়োজন জনসাধারণের নেই ; তাই হৈ হৈ করে জীবনটাকে সম্ভোগ করে নিতে সকলেই ব্যস্ত। এই নব্য চার্বাকপন্থীরাও বলেন—

"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতো।"

জীবন যখন একটা বই নেই—তখন

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।"

তা সুখে থাক্ ক্ষতি নেই, অন্যের দুঃখের কারণ না হলেই হল।

আমরা এখন যাচ্ছি 'মিন্নেহাহা ফলস্' দেখতে, পথের দু'পাশে যে কয়টা হ্রদ দেখতে পাব তা ফাও। হ্রদ দুটি দেখার পর গাড়ী এখন মিন্নেহাহার দিকে হু হু করে ছুটছে। গাড়ী যাচ্ছে ত যাচ্ছেই; অনেকটা পথ গিয়ে অনেক চক্কর কেটে গাড়ী শেষটায় "মিন্নেহাহা ফলস্"-এর পাশে দাঁড়াল। মিন্নেহাহা দেখে আমরা ত হা,—এটাকে falls মনে প্রপাত বলতে হবে! এত falls নয়, Truely false। এটা ত একটা ছোট নালা বিশেষ,—একটা হ্রদ থেকে বেরিয়ে ১৫/১৬ ফিট উঁচু খানকয় পাথরের চাঁই ডিঙ্গিয়ে কিছুটা শব্দ করে কিছুটা ফেনা-ছিটিয়ে নাতিতীব্রগতি একটা নালা,—থুড়ি স্রোতস্বিনীর রূপ নিয়েছে। আসামে ত পায়ে পায়ে এহেন 'ফলস্' গণ্ডায় গণ্ডায়। এই মিনি (mini) ফলস্ হাহাকে দেখে সবাই (maxi) মেক্সি হা হা করে হেসে উঠলাম।

তবে একটা কথা মানতেই হবে। উচ্চতার কৌলিন্য এই প্রপাতটির নেই বটে, তবে তার অভাব পুষিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় পুরকার্তারা তাঁদের প্রচুর উৎসাহ, উদ্দীপনা, উদ্ভাবনীশক্তি, প্রখর কল্পনাশক্তি আর নিরলস কর্মশক্তি দিয়ে।

এই বহমান ক্ষীণধারার দু'পাশে সামান্য ঢালুজমিতে গাছ, ঘাস ও ফুলের বাগান লাগিয়ে, গাছের ছায়ায় কাঠের বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতি পেতে চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা তৈরী করে দিয়ে,—নালার উপর জায়গায় জায়গায় পুল তৈরী করে দিয়ে এমন বন্দোবস্ত করেছেন যে এটা একটা চমৎকার বেড়াবার জায়গা হয়ে গিয়েছে! দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও কিশোর কিশোরীরা খালের জলে সাঁতার কাটছে, কেউ লম্বা লম্বা কেনো (Canoe—সরু লম্বা নৌকা বিশেষ) চড়ে জলবিহার করছে; কেউ বা মাছ ধরতে ব্যস্ত। একটা অপেক্ষাকৃত

নিরালা জায়গায় গাছের আড়ালে বসে এক যুবক স্কেচ বুকে ছবি আঁকছে দেখে ভারী ভারী ভাল লাগল।

খালের পাশ দিয়ে রাস্তা,—সেখানে কেউ দৌড়াচ্ছে কেউ সাইকেল চালাচ্ছে, কেউ ঘোড়া চড়ছে। সত্যি বেড়াবার পক্ষে আদর্শ স্থান এ জায়গাটা।

আমরা মিন্নেহাহা ফলসের তীরে তীরে অনেকটা ঘুরে বেড়ালাম এবং সেখানে ওদের বেসবল ও ফুটবল খেলা দেখে বাড়ী ফিরলাম সে দিন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই মিন্নেহাহা ফলস 'মিনি' ফলস্ হলেও বেড়াবার পক্ষে আদর্শস্থান!

কাছে পিঠের প্রায় সবকটা হ্রদই দেখা শেষ-একমাত্র মিনিটঙ্কা ছাড়া। মিনিটঙ্কা দেখতে টঙ্কা 'মিনি'ই লাগে,—কারণ হ্রদটা শহরের প্রায় বুকে। তাই এখানে দর্শক এবং মৎস্যশিকারীদের বেশ ভিড়। খুব বড় না হলেও মাঝারি আয়তনের হ্রদ এটা। এই হ্রদ থেকে জল খালাসের জন্য একটা ছোট 'লকগেট'-এর ব্যবস্থাও এখানে আছে।

আমাদের পিণ্টুর আবার মাছ ধরার শখ; গাড়ীর পেছনে সর্বদা মাছধরার সাজ সরঞ্জাম বয়ে বেড়ায়। আজ এখানে হ্রদ দেখতে আসার সুযোগ পেয়ে ধারে কাছেই একটা সুবিধা মত জায়গা দেখে ছিপ নিয়ে বসে গেল। মাতা পুত্রী শিশু দৌহিত্রটির হাত ধরে ইতস্তত: পায়চারি করতে লাগলেন। আমার আবার মাছ ধরা বা খাওয়া—কোনোটাতেই বিশেষ শখ নেই। তাই গুটি গুটি চলে এলাম লক গেটের উপরে,—সেখান থেকে জলের স্রোত আর চার পাশের দৃশ্যাবলী দেখতে থাকলাম, কখনো বা আড় চোখে পিণ্টুর মাছ ধরা।

পিণ্টুর ভাগ্য আজ বড় অপ্রসন্ন,—পার্শ্ববর্ত্তী আমেরিকান ভদ্রমহিলার ছিপে চটপট মাছ উঠছিল,—আর পিণ্টুর বড়শি সে দিন 'অচ্ছুৎ।

—"যস্মিন দেশে যদাচার।"

এদেশে 'Ladies first' সংস্কার অতি প্রবল। এ দেশীয় মাছ কিনা —হয়ত তাই মহিলাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছিল।

অবশ্য তারপরে পর পর দুদিন অনেক মাছ ধরে পিণ্টু সে দিনের ব্যর্থতার গ্লানি সুদে আসলে উঠিয়ে নিয়েছিল এবং তার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণকে পরম তৃপ্তি সহকারে টাট্‌কা মাছের ঝোল খাইয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল।

এ দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় হয়েছে,—তার দীর্ঘ বিবরণ তোমাকে দিলাম।

এ দেশের মানুষের সঙ্গে সম্যক না হোক কিঞ্চিৎ পরিচয় নিশ্চয়ই হয়েছে,—তা না বল্লে ভ্রমণ বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ক্যানেডি এয়ারপোর্টের কাষ্টমস অফিসারের অযাচিত সাহায্যের কথা আগেই বলেছি। এবার অযাচিত সাহায্যের আরও কিছু বিবরণ দিচ্ছি।

তখন পিণ্টুরা সবেমাত্র "মেপল গ্রোভ"এর নূতন বাড়ীতে এসেছে। বাড়ী গোছগাছ করার জন্য দু'চার দিন ছেড়ে দিয়ে আমেরিকান প্রতিবেশীরা একে একে এসে পিণ্টুর সঙ্গে দেখা করে গেলেন এবং টাইপ করা কাগজে প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের নাম ও টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—প্রয়োজন হলে বিনা দ্বিধায় পিণ্টু যেন ফোন করে। এঁরা কেউ সুদূর নরওয়ে থেকে এসেছেন, কেই জার্মানী বা ইটালী থেকে, কারো বা দেশ ছিল সুদূর আফ্রিকায়। আকারে প্রকারে গাত্রবর্ণে প্রভেদ বিস্তর কিন্তু সহৃদয়তায় সবাই সমান।

নূতন বাড়ীতে মাতা, কন্যা, শ্বশুর, জামাই মিলে জিনিষপত্র প্রায় গুছিয়ে এনেছি। এবার বাড়ীর 'লন'-এ ঘাস লাগাতে হবে,—এটা বাধ্যতা-মূলক। ব্যাপারটা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ, তবে নিজের হাতে করলে খরচ কিছুটা কম। তাই ঠিক হল—শ্বশুর জামাই মিলে ধীরে সুস্থে এ কাজটি সম্পন্ন করা হবে। একদিন বিকেলে পিণ্টু আর আমি বাড়ীর সামনের দিকটাতে ঘাস লাগাবার চেষ্টায় আমি,—হেনকালে হাফপ্যাণ্ট পরে, হাতে দস্তানা লাগিয়ে তৈরী হয়ে পাশের বাড়ীর ভদ্র-

লোক অযাচিত ভাবে সহাস্য বদনে উপস্থিত—ঘাস লাগাতে আমাদের সাহায্য করবেন বলে। আমাদের কোনো আপত্তি কানেই তুললেন না —তিনি দেখেছেন আমরা বাগানে ঘাস লাগাচ্ছি;—সুতরাং সাহায্য করবেনই। গায়ে জার্মান রক্ত,—শালপ্রাংশু দেহ, করীশুণ্ডবৎ বাহুদ্বয় —হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে চার জনের কাজ একাই করে গেলেন। আমাদের দেওয়া ধন্যবাদ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন—যেন তিনি কিছুই করেন নি।

ওদিকে পিণ্টুর দপ্তরের বড় সাহেবের মালুম হয়েছে যে পিণ্টু একা একা তার নূতন বাড়ীর লনে ঘাস লাগাচ্ছে। তাঁরা পরের শনিবার সদলবলে পিণ্টুর বাড়ী এসে হাজির—নূতন বাড়ীতে চড়ুইভাতি করার ছলে।

বাড়ীর নীচতলার ঘরে একজন রইলেন রান্নার কাজে। তিনি নিজেদের আনা উনুনে রুটি সেঁকলেন ও ঝলসিত মাংস তৈরী করলেন, অন্যেরা হৈ হৈ করতে করতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিরাট লনে ঘাস লাগান শেষ করে—হাত মুখ ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চড়ুইভাতি লাগিয়ে দিলেন। মিতা জোগাল নানা উভয়-দেশীয় খাদ্য ও পেয় এবং গৃহিণী জোগালেন বৈষ্ণব মতে তৈরী বিশুদ্ধ সিঙ্গাড়া।

মহা উৎসাহের সঙ্গে চড়ুই ভাতি পর্ব শেষ করে মহাখুসি মনে সবাই চলে গেলেন। পিণ্টুর টাকা বা পরিশ্রম বাঁচাতে তাঁরা এসেছিলেন—সেটা মানতে নারাজ—যেন নিছক চড়ুইভাতি করতেই তাঁরা এসেছিলেন।

আর একদিনের কথা,—সে দিন মিতার নাচতুত বোন রীতার বাড়ী বেড়াতে গেছি। (মাসী থেকে মাসতুত হলে এক সঙ্গে নাচলে 'নাচতুত' হবে না কেন?) সেখানে এক আমেরিকান দম্পতির সঙ্গে দেখা হল। আলাপ পরিচয় হলে জানালেন যে তাঁরা উভয়েই সম্প্রতি ভারত ভ্রমণ করে এসেছেন। প্রায় দুইমাস ভারতে ছিলেন। কোলকাতার গোলপার্ককে কেন্দ্র করেই তাঁরা ভারত ভ্রমণ করেছেন। বল্লেন

—আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, দিল্লী—এসব জায়গা খুব ভাল লেগেছে। তবে বেশী ভাল লেগেছে—কোলকাতাকে এবং বাঙ্গালীদের। তাদের শত দুঃখ দুর্দ্দশা সত্ত্বেও কোলকাতার জনসাধারণ নাকি অসাধারণ উদার মিশুক আর অমায়িক। তাঁদের অনুক্ষণ সাহায্য করেছে, নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছে,—নিজেদের দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়েছে, তেমনি আমেরিকার সম্বন্ধেও জানতে চেয়েছে এবং সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শহর থেকে ৪/৫ মাইল দূরের গ্রাম বাংলার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

ওদের সঙ্গে এঁরা কোলকাতার ভিড়ের মধ্যে বাসে ভ্রমণ করেছেন এবং কোলকাতার দুর্গাপূজা খুব উপভোগ করেছেন। তাঁদের মতে বাঙ্গালীরা খুবই শিল্প-প্রিয় এবং সঙ্গীতপ্রিয় জাত; এত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও এত প্রাণবন্ত যে তাঁদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে।

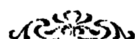
ওদের এই সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশংসা না করে থাকি কী করে!

রাজনীতি ? এখানকার জনসাধারণ নিজেদের জীবনযাত্রার কথা ছাড়া অন্যদের সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তবে রাজনৈতিক নেতারা সর্বত্রই সমান। নেতা (নক্ত্য)-র এক অর্থ ছিন্ন বস্ত্রের টুকরা যা দিয়ে ঝাড়পোছের কাজ চলে যায়। তবে এই নেতারা যা কিছু স্পর্শ করেন তা পরিস্কৃত না হয়ে মলিনতর হতে বাধ্য। সুতরাং ওদের 'অকথ্য' কথা যত অকথিত থাকে ততই ভাল।

মিনিয়াপোলিস পরিক্রমা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখারও শেষ লেখারও শেষ।

সুতরাং এবার "আমার কথাটি ফুরাল।"

নটে গাছের আর মুড়িয়ে কাজ নেই। ষাট! বালাই! বেঁচে বর্তে থাক। ইতি



[ডুলুথ—সুপিরিয়র হ্রদের তীরে তীরে]

রেডিসনইন্ ডুলুথ মিনিয়াপোসিস্
২১শে আগষ্ট।

ভেবেছিলাম—এবারকার মত আমেরিকা দর্শন আমাদের শেষ হয়েছে! কিন্তু মিতারা ভাবছিল অন্য রকম,—ডুলুথ আর শিকাগো—এদের মধ্যে কোনটা দেখাবে,—না দুটাই। গৃহিনীর মধ্যস্থতায় সে প্রশ্নের সমাধান শেষ পর্য্যন্ত হল। পূর্বদিকে কোথাও গেলেই শিকাগো পথে পড়বে, সুতরাং পূর্ব থেকে দেখে না রাখলেও ওটা মিতার বহুবার দেখা হবেই। 'ডুলুথ' ত আর কোথাও যেতে পথে পড়বে না; তাছাড়া জায়গাটাও নাকি খুব সুন্দর। তাছাড়া পিণ্টুর দপ্তরের বড়কর্তা এবং বন্ধু কিছুদিন আগেই নাকি তার মা বাবাকে ডুলুথ দেখিয়ে এনেছে। সুতরাং পিণ্টু ও মিতার বক্তব্য তারাই বা কেন মা বাবাকে ডুলুথ দেখিয়ে আনবে না। ন্যায্য কথা; সুতরাং ডুলুথ যাওয়াই ঠিক হল।

এক রবিবার সকাল সকাল 'ব্রাঞ্চ' অর্থাৎ 'ব্রেকফাষ্ট' ও 'লাঞ্চ'-এই সঙ্গে শেষ করে নিয়ে শ্রীমার নাম স্মরণ করে গাড়ীতে চড়ে বসা হল। রৌদ্রস্নাত মিনিয়াপোলিসের সাজান বাড়ীঘর রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে মিসিসিপি নদীর পুল পার হয়ে চল্লাম। গাড়ীতে পেট্রোল ভরে নিয়ে ৩৫ নম্বরের রাজবর্ত্মে এসে পিণ্টু মিতাকে গাড়ী চালাবার ভার দিয়ে "রাস্তার মানচিত্র' হাতে নিয়ে পাশের আসনে বসে পড়ল। পেছনের সিটে নাতি কোলে দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা রাস্তার দু'পাশের সবুজের সমারোহ মুগ্ধ নেত্রে দেখতে দেখতে চল্লাম।

'যমজ নগরী'—সেণ্টপলস্ আর মিনিয়াপোলিস তার মাঝখান দিয়ে বইছে মিসিসিপি নদী। তাদের একে একে অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি। জমির বন্ধুরতা হ্রাস পেয়ে ক্রমেই সমতল ক্ষেত্রে

পরিণত হচ্ছে। যতই উত্তরের সমতল ক্ষেত্রের দিকে এগুচ্ছি—ততই দৃশ্যপট সাদামাটা হয়ে যাচ্ছে ;—সে চমক আর নেই। তবে সে নৈরাশ্য ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতি দেবী যেন প্রসাধন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দু'পাশের মাঠ কোথাও আবাদ করা, কোথাও পতিত। সেখানে বুনো ঘাসের ফুলে ভর্তি দীর্ঘতৃণাকীর্ণ প্রেইরী 'প্রান্তর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। মাঝে মাঝে দু'চার খানা বাড়ী, উঁচু উঁচু 'সাইলো' অর্থাৎ উচ্চগম্বুজসদৃশ শস্যাগার আর পাইন সিডারের জটলা। কৃষ্ণহরিৎ পত্রবিশিষ্ট 'এ্যাস' আর 'কটনউড' গাছগুলি বেশ পত্রবহুল ছায়াতরু ; কিছুটা আমাদের দেশের অশ্বত্থ গাছের মত ; তবে তুলনায় গাছও ছোট। পাতাও তাই। 'মিনেসোটা' আর 'উইসকনসিন'—এ দুটি রাজ্যে পায়ে পায়ে হ্রদ, ছোট হলেও নদীর সংখ্যাও কম নয়। নিস্তরঙ্গ মসৃণ জমি, দু'দিকে ক্ষেত খামার।

মিতা গাড়ী চালাচ্ছে, অগুণতি গাড়ী তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, 'সাবধানী পথিক',—নির্দ্ধারিত ঘণ্টায় ৫৫ মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে ছোট মাঝারি, নানা আকারের হ্রদ আর হ্রদের জলে সূর্য্যালোকের ঝিকিমিকি।

হ্রদ নিয়ে দুই পাশাপাশি রাজ্যের বেজায় অভিমান ; গালগল্পও তেমনি। কোনো এক 'পল বুনিয়ানের এক নীল ষাঁড়ের ক্ষুরের ঘায়েই নাকি এ রাজ্যের অসংখ্য হ্রদের উৎপত্তি।

এ রাজ্যের অন্তর্গত 'ব্রাউন্সভেলি'তে যখন প্রথম নরমুণ্ড আবিস্কৃত হল তখন ঐতিহ্য নিয়ে এ রাজ্যের গুমর কত! এঁরা সদম্ভে দাবী করে থাকেন এই রাজ্যে ১২,০০০ বৎসর পূর্বেও মানব বসতি ছিল। এঁরা এটাও বলে থাকেন যে প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বেই নরওয়ে থেকে কিছু অভিযাত্রী এ রাজ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

কলম্বাসের বহু পূর্বেই যে নরওয়ের ভাইকিংরা উত্তর আমেরিকাতে যাতায়াত করতেন এটা ত আজকাল বহু বিদগ্ধজনই মেনে নিয়েছেন।

তবে এটা ও জানা যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে 'চিপ্পেওয়া' ও 'সিওক্স' গোষ্ঠীর ইণ্ডিয়ানদের পুরোদস্তুর অধিকার কায়েম ছিল। ইতিহাস এটা ও বলে যে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মিনেসোটাতে শ্বেতাঙ্গদের প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল! তাঁরা ছিলেন ফরাসী; বিখ্যাত 'রেডিসন' ও 'ডুলুথ'—তাঁদের অন্যতম। এই অভিযাত্রীদের প্রচেষ্টাতেই সুপিরিয়র হ্রদের পাড়ে একটা দুর্গ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর ও পশ্চিমের অঞ্চল ছিল হ্রদ, ঝর্ণা ও আদিম পাইন অরণ্য সমৃদ্ধ। তারই আকর্ষণে লোক বসতি এখানে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নরওয়ে, জার্মানী ও সুইডেন থেকে বন্যার মত মানুষের প্লাবন শুরু হয়ে গেল। অচিরে এই অঞ্চলে কৃষি, পশুপালন আর কাঠের ব্যবসায় জমে উঠল।



১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডুলুথের উত্তর 'কিউইউনা', মেসারি'ও 'ভারমিলিয়ান-রেঞ্জ'-এ লৌহের আকর আবিস্কৃত হয়। তারপর থেকে এ অঞ্চলের প্রখর শীত সত্ত্বেও ব্যবসা বাণিজ্য এখানে খুব জমে উঠল।

স্থলভূমি মধ্যস্থ বন্দর (Inland Port) হিসাবে সেই সময় থেকেই ডুলুথের খুব সুখ্যাতি। কাঠ; লৌহ প্রস্তর আর উইসকনসিনের গম চালান দেবার জন্য এর চাইতে যোগ্যতর বন্দর আর নেই। ডুলুথের পথের বিবরণেই ফিরে যাচ্ছি।

ডুলুথ পৌঁছাবার বেশ কিছু আগে থেকেই ছোট খাট টিলা আর পাহাড় শুরু হয়ে গেল। পাইন, পপলার, সিডার, মেপল, বার্চ্চ, এ্যাস, সিলভার এ্যাস প্রভৃতি আঞ্চলিক বৃক্ষের ঘন বন নাকি ডুলুথের পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আরও শুনেছি ডুলুথগামী এই রাস্তা নাকি অক্টোবরের 'ফল'-এর সময় অত্যন্ত রমনীয় হয়ে উঠে। চিরহরিৎ পাইন ছাড়া আর সব গাছের পাতা নভেম্বরের প্রথম দিকেই ঝরতে শুরু করে। তবে 'যাবার আগে'—তারা বনভূমিকে 'রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়।'

বনস্পতিরা যখন হরিৎলাবণ্য বর্জ্জন করে বর্ণ থেকে বর্ণান্তর গ্রহণ করতে থাকে—তখন বৃক্ষে বৃক্ষে নানা বিভিন্ন রকমের হলুদ, লাল ও বাদামী রং এর সমন্বয়ে এক অপরূপ মায়াকাননের সৃষ্টি হয়; আর সে দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার যাত্রীর ভিড় তখন এ অঞ্চলে।

ডুলুথ শহর থেকে পাহাড় আর সুপিরিয়র হ্রদের গা ঘেঁষে একটা আঁকা বাঁকা রাস্তা সিধে ক্যানেডা পর্য্যন্ত চলে গেছে। সে রাস্তার ত্ব'পাশে নাকি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের পশরা।

এসব দৃশ্য দেখার আশায়ই ত আমাদের এখানে আসা।

এ দেশ হল 'দুর্লভ পদযাত্রী'র দেশ, এদেশে পথে চলে পথিক নয়, গাড়ী। আজ কিন্তু রাস্তা অনেকটা ফাঁকা; হয়ত মিতার বরাত জোরে।

আমরা 'শিকাগো' শহরকে এক পাশে রেখে এগিয়ে চলেছি। সেন্ট ক্রয় নদী নাকি খুব সুন্দর; দেখার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। আমাদের ৩৫ নম্বর রাজপথ থেকে নদী অনেকটা দূরে।

চোখের সামনে দিগন্ত প্রসারিত পুষ্পিত 'প্রেইরী' প্রান্তর, তৃণাকীর্ণ মাঠে সাদা, কালো, পাটলি বর্ণের গরু চরছে। উত্তর আমেরিকা তার 'মাষ্টাঙ্গ' জাতীয় বন্যঘোটকের জন্য বিখ্যাত। তবুও ঘোড়া কদাচ চোখে

পড়ছে। তবে এ অঞ্চলটা ত আর বুনোঘোড়ার অঞ্চল নয়-মিনেসোটার মাটির শ্যামাঞ্চল মাত্র।

ক্রমে আমরা 'লিগুষ্টর্ম,' 'নর্থব্রেঞ্চ', 'হ্যারিস' প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছি। তার পর কী আশ্চর্য। মিতার গাড়ী rush না করেও 'রাশ সিটি' (Rush city) অতিক্রম করে গেল। এবং মোটেও pine না করে পাইনবৃক্ষ সমৃদ্ধ পাইন সিটি (Pine city) তে পৌঁছে গেলাম। তার কিছু পরই একটা ছোট্ট নদীর দেখা পেলাম : নাম "স্নেক রিভার", সর্পিল গতিতে এঁকে-বেঁকে বয়ে যাচ্ছে। এখানকার ছোট্ট ছোট্ট নদী দেখলে কেমন যেন বাৎসল্য রসের উদয় হয়। দুই তীরের বুনো ঘাসের ফুল হাওয়ায় কাঁপছে, নদীর বুকে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড় জেগে আছে : স্রোতস্বিনী সেখানে ঈষৎ ফেনশুভ্রা— কিঞ্চিৎ কল্লোলিনী। দুই তীরের তরুরাজি যেন অপত্য স্নেহে তাকে ডালপালার বাহু মেলে আগলে রেখেছে।

নদীটিকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। জমি এখানে সামান্য উর্দ্ধাভিলাষী,—ঢেউ দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে,—সেখানে বার্চ্চ গাছের সাদা ডালপালায়, এ্যাস, পাইন, পপলারের হরিৎ লাবণ্যে নীল আকাশের পটভূমিতে এক পরীর রাজ্য।

'সেণ্ডষ্টোন' পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কিছুদূর গিয়ে 'ফিন্‌লেসন' এ আর একটা নদীর দেখা পেলাম,—নাম 'উইলোরিভার'। ভারী সুন্দর ছায়াঘন টলটলে জল। দু'পাশের দৃশ্য থেকে আর চোখ ফেরান যাচ্ছে না;—এত সুন্দর। ঢেউ খেলান তৃণাকীর্ণ প্রান্তর যেখানে আকাশে গিয়ে মিশেছে—সেখানে নীল আকাশের গায়ে পাইন পপলারের মন্দিরাকৃতি মূর্ত্তি ছবির মত দেখাচ্ছে। পাইনবন ক্রমেই রাস্তার নিকটবর্ত্তী হচ্ছে,—যত্ন করে লাগান নানা জাতীয় পাইনের ছোট বড় চারা সবুজ প্যাগোডার মত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি ঘরে ঘরে 'লন' সাজাতে মেপল আর পাইন চারার খুব চাহিদা এখানে। খুব চড়া দামে বিক্রী হয়ে থাকে।

অক্টোবরের 'ফল'কে আগষ্টের শেষে দেখার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য, তবুও উদগ্রীব হয়ে আছি—যদি কোথাও কিছু আভাস মিলে। বনের মধ্যে দু'একটা বার্চ্চ গাছের মাথায় পাক ধরা চুলের মত কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভাস, নীচের আগাছা ও গুল্মলতায় কোথাও অকালবার্দ্ধক্যের পীত ছোপ। জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা শুকনো পাইনগাছ-বাদামী ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সবুজের সমারোহের মাঝখানে এই রিক্তপত্র শুকনো ডালপালা যেন আকাশের পটে আঁকা একখানা ছবি।

রাস্তার দু'পাশে এখন ঘন বন আর পাহাড়,-মাঝে মাঝে ছোট খাট হ্রদের জলে আলোর ঝিলিক। ষ্টেট ফরেষ্ট পার হয়ে যাবার পর আমাদের ৩৫ নম্বরের রাজপথ "ষ্টারজিয়ন হ্রদ" এর পাশ ঘেঁষে চল্ল। তারপর এল 'আইল্যাণ্ড লেক' এবং কিছুক্ষণ পর 'মুজলেক'।

রাস্তার দু'পাশের জমি ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে টিলা এবং টিলা থেকে পাহাড়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। পাথুরে পাহাড়ের মাথা কোথাও ন্যাড়া, কোথাও বা পাইন, পপলার সিডারের বনে সবুজ,—যেন নীল আকাশের পটে আঁকা ছবি। ঘননীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ। পাহাড় বা বন কোনোটাই একটানা নয়। মাঝে মাঝে আন্দোলিত তৃণাকীর্ণ প্রেইরী প্রান্তর—তার ঢেউ-খেলান বুনো ঘাস আর অজস্র সাদা হলদে বেগুনী বাদামী ফুলসম্ভার নিয়ে যেন আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকছে।

আজ আবহাওয়া খুব ভাল; বাতাসের সামান্য শৈত্যে খুব উপভোগ্য মনে হচ্ছে। বাইরে আকাশের নীলে,মেঘের ছায়ায়, বনের মাথায় মাখামাখি। রাস্তার বাম পাশের পাহাড় ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। মনে হচ্ছে ডুলুথ আর বেশী দূরে নয়। বাঁকের পর বাঁকে,—নীল আকাশের গায়ে কৃষ্ণনীল পাইন বার্চ্চ পপলারের চূড়ায় চূড়ায়—পাহাড়ের মাথায় মাথায় —নব নব সৌন্দর্য্যের পশরা।

'বার নাম', 'মাহতোয়া' প্রভৃতি জনপদ ইতিমধ্যেই পার হয়ে

এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাম 'ছইয়ার' (Sawyer) এ। অতি সুন্দর স্থান মানছি, তাই বলে Sawyer! হাঁ, হাঁ বাবা-ইয়ার খুব ভাল ভাবেই Saw। তাই বলে এত দেমাক। পড়তে আমাদের দেশের কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর পাল্লায় তবে কবেই ইয়ারদের saw করে একেবারে গ্যাড়া Baldwin বানিয়ে ছাড়ত!

পাহাড়ী পথের পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে গাড়ী ডুলুথের দিকে এগিয়ে চলেছে। উত্তর দিক চক্রবালে উঁচু উঁচু সৌধশ্রেণী দেখতে পাচ্ছি এখন। পাথরকাটা রাস্তা কোথাও উঁচু কোথাও ঢালু। এক পাশের জমি ক্রমে ঢালু হয়ে নীচের ঘাসের বনে নেমে গেছে। সেখানে থোকা থোকা হলদে ফুল হাওয়ায় দুলছে। অন্য দিককার পাথর কেটে নেওয়া আহত পাহাড়ের ভাঙ্গা পাজরে যেন রক্ত জমে কালচে লাল হয়ে আছে। তার মাথায় মাথায় পপলার, বার্চ, সিডার, এ্যাস আর পাইনের বন। মাঝে মাঝে দু'চার খানা বাড়ীর বিরল উপস্থিতি কোনো মতে জনবসতির সাক্ষ্য বহন করছে ঘন নীল নভে শুভ্র মেঘে পুঞ্জ,— যেন নীল নদী নীরে ভাসমান শুভ্র ফেন পুঞ্জ। ডুলুথের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। উড়াল পুলের পর উড়ালপুল পেরিয়ে আমাদের গাড়ী ডুলুথে প্রবেশ করল।

এবার আমাদের গন্তব্য স্থান 'রেডিসনইন' খোঁজার পালা। পিণ্টু রাস্তার মানচিত্র দেখে নির্দেশ দিচ্ছে আর মিতা সাবধানে গাড়ী চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রেডিসনইনের সুউচ্চ গোলাকার সৌধ নজরে পড়ল।

হোটেলে পৌঁছে, মালপত্র কামরায় নিয়ে আসতে আসতে দু'টার কাছাকাছি হয়ে গেল. স্থির হল একটু খাওয়া দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে সবাই ষ্টিমারে করে বেড়াতে যাওয়া হবে।

তৈরী খাবার সঙ্গে মজুদ ছিল, হাত মুখ ধুয়ে সবাই কিছুটা খেয়ে নিলাম এবং অতঃপর বিশ্রাম। তিনটার কিছু পরই হোটেল ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়লাম—ষ্টিমারের উদ্দেশে।

ছোট শহর,—ষ্টিমার জেটি কেন—লেক সুপিরিয়র সহ সমগ্র ডুলুথ শহরটাই হোটেলের কামরা থেকে দেখা যায়। তবুও চট করে কোথাও পৌঁছাবার উপায় নেই। রাস্তা পারাপার করবার বা এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তাতে যাবার পরিস্কার নির্দ্দেশ রাস্তায় রাস্তায় দেওয়া আছে, অমান্য করলেই তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে পাকড়াবে। ঘুরে ঘুরে জেটিতে পৌঁছাতে এবং উপযুক্ত স্থানে গাড়ী দাঁড় করাতে অনেকটা সময় লেগে গেল। এবার টিকিট কিনতে লাইন দেবার পালা। পাইনের মোটা মোটা গুড়ি মাটিতে পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে সাপের মত আঁকা-বাঁকা লাইন তৈরী.—সেখানে শিশু কোলে তরুণী, জননী; কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা নানা বয়সের নানা দেশের মানুষের সমাবেশ। বেলা সাড়ে তিনটা বেজে, গেছে—রৌদ্র বেশ কড়া, তবুও বাতাস ঠাণ্ডা বলে উপভোগ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই "ডুলুথ এক্সস্কারসানস্" এর এক খানা ষ্টিমার ঘাটে এসে ভিড়ল। এই কোম্পানীর দুটি ষ্টিমার; অপেক্ষাকৃত বড়টির নাম "এস এস ভিষ্টা কিং" আর অপেক্ষাকৃত ছোটটি হল "এস এস ভিষ্টা কুইন"। এই দুটি ষ্টিমার নিরন্তর মিনেসোটার ডুলুথ আর উইসকনসিনের 'সুপিরিয়র'-এই দুই বন্দরের মধ্যে যাত্রা নিয়ে যাতায়াত করে।

আমাদের ভাগ্যে রাজার আশ্রয় জুটেনি; রাণীর আশ্রয় পেলাম শেষ পর্য্যন্ত। বহু যাত্রী নামল, বহু যাত্রী উঠল এবং এক সময় ষ্টিমার ছেড়ে দিল। একজন ষ্টিমারের কর্মী মাইক্রোফোনে নানা স্থানের ইতিহাস বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন!

'ডুলুথ' আর 'মিনেসোটা পয়েন্ট' এর মধ্যে একটা লোহার সেতু রয়েছে; নাম 'এরিয়েল লিফ্ট ব্রিজ'। বন্দর থেকে বেরুতে বা বন্দরে ঢুকতে হলে জাহাজকে এই সেতুর তলা দিয়ে যেতে হয়।

এই সেতুটার সাধারণ অবস্থান জলের সামান্য উপরে; মাটির সমতলে। ডুলুথ শহর থেকে মিনেসোটা পয়েন্ট যাবার এটাই একমাত্র সদর রাস্তা। মিনেসোটা পয়েন্ট একটা সাত মাইল লম্বা অন্তরীপ-

লেক সুপিরিয়রের গায়ে সূঁচের মত বিঁধে আছে যেন। তাতে বহু সুইমিং পুল, স্নানের জন্য বেলাভূমি (Beach), নৌকার ক্লাব, সি প্লেনের বেস (sea plane base) প্রভৃতি রয়েছে। সেতুটি চার শ ফিট লম্বা। জাহাজ আসলে সেতুটিকে উপরে তুলে দেওয়া হয়, আবার চলে গেলে যথাস্থানে নামান হয়। তখন সেটি আবার সাধারণ রাস্তা হয়ে যায়। এ যেন শাপগ্রস্তা উর্বশীর দিনে ঘোটকী আর রাত্রে স্বমূর্ত্তি ধারণ। জাহাজ থেকে এটাকে বারকয় উঠানামা করতে দেখলাম।

হ্রদ এ জায়গাটায় তেমন বিস্তৃত নয়; দুই তীরের জনপদ ও তরুরাজি বেশ দেখতে পাচ্ছি। মাইক্রোফোনে ক্রমাগত বর্ণনা চলছে—
—"এই যে জাহাজটা নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে গত মহাযুদ্ধে এটা সামান্য ঘায়েল হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মন গম ইত্যাদি এটা বহুবার শত্রুব্যূহ ভেদ করে ইয়োরোপে বহন করে নিয়ে গেছে। তাই এখন এটাকে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। কখনো বড় বড় গম বা লোহার আকর বোঝাই করার নানা যন্ত্রপাতি, গুদাম, দালানকোঠা দেখিয়ে যাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডার স্ফীত করার জন্য জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে,—"এটা দিয়ে মিনিটে এত হাজার টন লোহার আকর বোঝাই করা হত।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে আমাদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কেউ যে খুব উৎসাহিতবোধ করছিলেন তাও মনে হল না এক বৃদ্ধা। আমেরিকান ভদ্রমহিলাকে ত স্পষ্টই বলতে শুনলাম—"Absolutely boaring" বেশ বিরক্তিজনক.

ওদিকে বিশেষ কান না দিয়ে হ্রদের জল দূরের গাছপালা, আকাশ আর নিকটের যাত্রীদের ব্যবহার বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করছিলাম।

এ জাহাজে বাইার থেকে খাবার দাবার আনা বারণ, খাবার দাবার এবং টুকিটাকি জিনিষের দোকান জাহাজেই আছে। সেখানে সর্বক্ষণ ভিড় লেগেই আছে। ২/৩টি অল্পবয়স্ক মেয়ে সেখানে কাজ করছে আর একটি যুবক সারাক্ষণ যাত্রীদের কামরা পরিস্কার করে চলেছে।

এদেশে অন্নভাব নেই, খাবে না কোন দুঃখে! মোটা হবার ভয়? তা এঁদের আছে বলে ত মনে হয় না। অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে ছাড়া ক্ষীণকায় ত চোখেই পড়ে না। উইসকনসিনের স্ত্রীপুরুষ ত বিরাট আকৃতির। খাওয়াও তেমনি সর্বক্ষণ। জাহাজে উঠেই ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছে, তাই অবিরত এটা সেটা কিনে খাচ্ছেন আর ক্ষণে ক্ষণে 'কোক' পান চলছে। জল পানীয় হিসাবে জলচল নয়; ককোকোলা জাতীয় পানীয়ই এদের 'জাতীয় পানীয়'— একমাত্র তৃষাহর।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ষ্টিমার লেক সুপিরিয়রের তীরের নানা জেটি, কোমর ভাঙ্গা জাহাজ ইত্যাদি দেখিয়ে অবশেষে উইসকনসিনের 'সুপিরিয়র' বন্দরে নোঙর করল।

এই রীতিমত ইনফিরিয়র বন্দরের নাম সুপিরিয়র,! নিশ্চয়ই এটা একটা রসিকতা।

এখানে বহু যাত্রীর আরোহণ অবরোহণ কিছুক্ষণ চল্ল খেয়ালের সাপট তানের মতন এবং এক সময় জাহাজ ডুলুথের দিকে রওয়ানা হল। আবার সেই একই দৃশ্য—জাহাজে উঠেই ক্ষুধার উদ্রেক, কেনা কাটা পান ভোজ, আগের মতই চলতে থাকল। ওদের ভোজন বিলাস দেখে মিতার ও ইচ্ছা-তার মা বাবা, ওদের মত আলু ভাজা ভুট্টা ভাজা খায়। আমরা আপত্তি জানালাম,—"পেট ওদের, পয়সাও ওদের—যা ইচ্ছা করুক। তাই বলে এই বাঙ্গালী পেটে এই বয়সে এই সব?—আমরা কি 'লক্কর হজম', পাথর হজম' করনেওয়ালা পালোয়ান?

এরপর আর ভজিত ভুট্টা প্রসঙ্গ চলতে পারে না।

বাইরের দিকে চোখ মেলে বসে আছি; মৃদু বাতাস বইছে, হ্রদের অস্বচ্ছ জলে চূর্ণ ঢেউয়ের মেলা। পর পারে নীলাভ তরুশ্রেণী, নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলা। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি—অদূরবর্ত্তী নানা জেটি, লোহা লক্কর বোঝাই করার নানা সাজসরঞ্জাম, মালবাহী দু'একটা জাহাজ জলে ঢেউ তুলে পাড়ি দিচ্ছে; ডাঙ্গার পাশে ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের মত দু'একটা প্রাচীন পেনশান প্রাপ্ত জাহাজ তীরের কাছে নোঙর করা।

স্থলাভ্যন্তরস্থিত বন্দরের মধ্যে ডুলুথের প্রসিদ্ধি বিশ্ববিশ্রুত। মিনেসোটা পয়েণ্টের দু'পাশে অসংখ্য 'ডকলাইন', সেখান থেকে প্রচুর লৌহ আকর আর গম পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী হয়ে থাকে। তবে শীতের কয়েক মাস—যখন সুপিরিয়র হ্রদ জমা বরফের তলায় নিদ্রামগ্ন—তখন জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকে।

ডুলুথ শহরটি পাহাড়ের উপরে জাহাজ থেকে পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজান শহরটিকে বড় সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের ধাপে ধাপে অসংখ্য সৌধ, বাগান, গাছপালা ; জায়গায় জায়গায় পাইন বার্চ্চ আর মেপল সিডারের বন পাহাড়ের মাথায় মাথায় ; নীল আকাশের পটভূমিতে তারা যেন আঁকা ছবি। দূর থেকে 'এরিয়েল লিফ্‌ট ব্রিজ' ও 'মিনেসোটা পয়েণ্ট'কেও খুব সুন্দর দেখায়।

পাকা দু'ঘণ্টা জলবিহার করে ষ্টিমার ডুলুথের ঘাটে নোঙর করলে আমরা নেমে পড়লাম। পিণ্টু গাড়ীটা নিয়ে এসে প্রস্তাব করল— "এখনো ছ'টা বাজেনি ত, সূর্য্যাস্তের ঢের বাকী ; এইবেলা 'নর্থসোর ড্রাইভ'টা একটু ঘুরে আসা যাক্।"

শুনে খুসী হয়ে বল্লাম—"খুব ভাল কথা ; তবে তার পূর্বে কিঞ্চিৎ চায়ের ব্যবস্থা করা জরুরী বলে মনে হচ্ছে।" মহা খুসী হয়ে পিণ্টু বল্ল "নিশ্চয়ই"।

অতঃপর সবাই গাড়ীতে চড়ে বসলাম। গাড়ী পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এগুচ্ছে ; পথের এক পাশে লেক সুপিরিয়রের আলো ঝলমল জল, অন্য পাশে দু'চার খানা বাড়ী ঘর, গাছপালা, সব কিছু মিলে যেন সাজান বাগান। কখনো বা রাস্তার দুই পাশেই পাইনের বন, মাঝে মাঝে ঘর বাড়ী ফুলের বাগান। গাছের ফাঁক দিয়ে কোথাও বা হ্রদের জলের ঝিকিমিকি। রাস্তার দু'পাশের জমি সবুজ ঘাসে ঢাকা, যেন সবুজ গালিচা দিয়ে মোড়া। রাস্তার অনতিদূরে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল তাতে পাইন, বার্চ্চ, এ্যাস, পপলার, ওক, সিলভার এ্যাস, বটবৃক্ষ সদৃশ বড় বড় 'কটনউড'—আরও কত কি নাম-না-জানা স্থানীয়

বনস্পতি। কোনোটাতে থোক থোকা লাল লাল ছোট ছোট ফল,— ঠিক যেন পুষ্পস্তবক। রাস্তার পাশে একটা সুন্দর রেস্তোরাতে পিন্টু গাড়ী থামাল। পাহাড় ভাঙ্গা অমসৃণ পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা অঙ্গনে গাড়ী দাঁড় করাবার অনেকটা জায়গা, সাজান বাগান, তার এক পাশে 'উইণ্ডোসার্ভিস' এর ব্যবস্থা। একটা বিশেষ জায়গায় 'মাইক' ও 'লাউড-স্পিকার' বসান। গাড়ীতে বসেই ওখানটায় 'অর্ডার' দিতে হয় এবং একটা বিশেষ জানালার ধারে গিয়ে সেখানে পয়সা দিয়ে খাবার সংগ্রহ করে নিতে হয়। এতে গাড়ী থেকে নামার প্রয়োজন পড়ে না; তাতে সময় বাঁচে। রাস্তার ধারে গাছের নীচে গাড়ী দাঁড় করিয়ে গাড়ীতে বসেও খাওয়া দাওয়া চলে। এরই নাম 'উইণ্ডো সার্ভিস'। ঠিক এই রকম না হলেও অনেকটা এ রকম ব্যবস্থা বেঙ্গালোরের এক বড় রেস্তোরাঁতেও পূর্বে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

আমার 'উইণ্ডোসার্ভিস' থেকে নাতিটির জন্য আইসক্রিম ও আমাদের জন্য গরম চা ও কফি সংগ্রহ করে নিলাম। একটা নির্জ্জন জায়গায় গাছের তলায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে আমরা কফি চা ইত্যাদি খেয়ে নিলাম। কাপ প্লেট কাগজের; তাই বলে যত্র তত্র ফেলবার উপায় নেই এদেশে। জায়গায় জায়গায় আবর্জ্জনা ফেলবার পাত্র রাখা আছে; আবর্জ্জনা ওখানেই ফেলতে হবে, অন্যথা বড় রকমের অর্থ দণ্ড। এদেশে ত আর "আইন অমান্য আন্দোলন" এর প্রচলন হয় নি; তাই আইন অমান্য করার স্পৃহা জনসাধারণের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তবে এর কতটা স্বঃপ্রবৃত্ত আর কতটাই বা দণ্ডের ভয়ে বলা শক্ত। কঠ উপনিষদে আছে না—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

অর্থাৎ তাঁর ভয়েই অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিচ্ছে, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু ধেয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছেন।

যাক্ গে—ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক—আমাদের মত সাধারণ লোকেরা সর্বত্রই আইন মেনে চলেই স্বস্তি পায়।

অতএব খুঁজে পেতে একটি আবর্জ্জনা ভাণ্ডে কাগজের কাপ প্লেট ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হল।

খেয়ে দেয়ে চাঙ্গা হয়ে এবার আমরা বিখ্যাত "নর্থসোর ড্রাইভ" ধরে চল্লাম। এ রাস্তাটি একেবারে লেক সুপিরিয়রের উপরে। একদিকে পাহাড়, জঙ্গল, কখনো বা তারই মধ্যে জনবসতি। অন্যদিকে উদার আকাশের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত সুপিরিয়র হ্রদ।

পথে অবশ্য "গ্লেনশীন" নামের একটা পুরানো আমলের বাড়ী পড়েছিল। বিশেষ দ্রষ্টব্য বলে এ অঞ্চলে তার খুব নাম ডাক। এর মালিক ছিলেন 'চেষ্টার এ কঙ্গডন' নামের এক ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পপতি, এটর্নী ও রাজনৈতিক নেতা,—ভেবে দেখ—কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

হ্রদের ঠিক উপরেই প্রকৃতির আদিম পরিবেশের মধ্যে সাড়ে সাত একর জমির উপরে তিনি জেকোবিয়ান ষ্টাইলে এক বিরাট বাড়ী বেঁধেছিলেন। অনেক খোদাই করা কাঠের ও রঙ্গিন কাঁচের পাত্র দিয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে বিচিত্র আলোর ব্যবস্থা করে তিনি বাড়ীটিকে নিজের মনের মত করে সাজিয়ে ছিলেন।

বর্তমানে চার থেকে পাঁচ ডলারের টিকিট কিনে সে বাড়ী দেখতে হয় এবং হাজার হাজার দর্শকের ভিড় তবুও লেগেই থাকে সেখানে।

এ বাড়ী দেখাটা কালকের জন্য মুলতবী রেখে আমরা এগিয়ে চল্লাম। পড়ন্ত সূর্য্যের আলোয় সৌন্দর্য্যের ডালি সাজিয়ে বসে আছে এই রাস্তাটি। বর্তমানে এটাই আমাদের একমাত্র দর্শনীয়।

ফুলের পর ফুল সূতায় গেঁথে তবেই না হয় ফুলের মালা;—তেমনি এই রাস্তাটিও যেন সূত্রের মত নয়ন বিমোহন দৃশ্যের পর দৃশ্য গেঁথে গেঁথে-এক অভিনব সৌন্দর্য্যমালিকা রচনা করে চলেছে।

এক পাশে সবুজ পাহাড়, ঘনবন,—মাঝে মাঝে এক আধখানা কাঠের

রঙ্গিন বাড়ী ; আর রাস্তার দু'পাশে বুনো ঘাসে অজস্র থোকা থোকা সাদা, হলুদ, লাল, বেগুনী ফুল হাওয়ায় দুলছে। অন্য পাশে এক ফালি সবুজ জমি ; তাতে দু'চারটি পাইন বা বার্চ্চ ; তার পরই স্থলভূমি জলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক অপরূপ তটরেখার সৃষ্টি করেছে।

এই ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের চাঙ্গড়ে গড়া সুদীর্ঘ তটরেখা ক্যানেডা পর্য্যন্ত চলে গেছে, দেখলে নিউহ্যাম্পসায়ারে দেখা আটলান্টিকের কথা মনে পড়ে,—যদিও সেই ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস সেই রাজকীয় মহিমা এখানে অনুপস্থিত। ওখানকার সৌন্দর্য্য উদগ্র, উচ্ছল, বহির্মুখী যেন উচ্ছলযৌবনা উর্বশী, আর এখানে শান্ত অন্তর্মুখী, আত্মসমাহিত,—যেন গৃহলক্ষ্মী।

একটা জায়গায় এসে গাড়ী থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বাম পাশে একটা ছোট্ট নদী পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ছোট্ট প্রপাত সৃষ্টি-করে ঝির ঝির ধারায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের উঁপর ঝরে পড়ছে! নদীর অপসির বুকে অনেক পাথরের টুকরা, ক্ষীণ ধারাটি সেখানে ঈষৎ ফেন-শুভ্রা ও গতিময়ী। উপরে একটা সেতু—যার উপর দিয়ে আমাদের রাস্তা চলে গেছে। রাস্থার ও পাশে পুলের অনতিদূরে নদীর ক্ষীণ ধারাটি হ্রদে এসে পড়েছে। হ্রদের বুকে বিরাট বিরাট পাথরের চাঙড়। তার উপর দাঁড়িয়ে দু'চার জন স্থানীয় লোক ছিপ ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন। প্রশস্ত প্রশান্ত হ্রদের মাথার উপরে মেঘমুক্ত আকাশে গৈরিক আলো। সকলেরই জায়গাটা খুব ভাল লাগল। ইচ্ছা হচ্ছিল অন্ততঃ ঘন্টাখানেক এখানে বসে থাকি,—কিন্তু সময়াভাব। অগত্যা কালকে আসবার সঙ্কল্প নিয়ে আমরা এই সৌন্দর্য্যের নন্দন কানন ছেড়ে এগিয়ে চল্লাম।

রাস্তার বাম পাশের পাহাড়ী অরণ্যভূমিতে সবুজের ললিত লাবণ্য, দক্ষিণে রয়েছে জলের আয়না বুকে নীরব নিস্তরঙ্গ হ্রদ আর গৈরিক আকাশের পটে চিত্রায়িত মন্দিরের চূড়ার মত পাইন শ্রেণীর শীর্ষ। কাকে ফেলে কাকে দেখি! উত্তর বাহিনী এ পথটাকে কি নামে ডাকব —'সৌন্দর্য্যের স্বীয় ধাম' না 'মহাসৌন্দর্য্যের পথ'।

কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই একি উপদ্রব। কমলবনে মত্ত হস্তীর মত—রাস্তায় কিছু দূরে দূরে মোটেল; পেট্রোল পাম্প, দোকান পাট ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছে দেখতে পাচ্ছি। মানছি এসবের খুবই প্রয়োজন রয়েছে,—তাই বলে নন্দন কাননে মুদীর দোকান!

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য হেলে পড়েছে, হ্রদের মাথার উপরে পূর্ব দিগ্বলয়ে এখনো কিন্তু রক্তিমাভাস,—বাতাস নাতিশীতল, সুখ স্পর্শ। জায়গায় জায়গায় গাড়ী থামিয়ে আমরা সবাই হ্রদের তীরবর্ত্তী পাথরের চাঙ্গড়ের উপর বসে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সুধা পান করছি। দেখছি —হ্রদের ভিজে বাতাস পথের দু'পাশের লম্বা লম্বা ঘাসের বনের হলদে বেগুণী ফুলের স্তবকে কেমন দোলা দিয়ে যাচ্ছে,—হ্রদের জলে চূর্ণ ঢেউ আর মাথার উপর বিস্তৃত আকাশে মন-উদাসী আলো। প্রস্তর সঙ্কুল ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাড় বেয়ে আমরা সবাই হ্রদের জল স্পর্শ করে আসছি আর ভাবছি অর্দ্ধেক পৃথিবী পরিক্রমার শেষে বিশ্ববিখ্যাত পঞ্চহ্রদের বৃহত্তম হ্রদটির পাড়ে বসে তার জল স্পর্শ করে মুক্ত আকাশের তলায় বসে আছি,—স্বপ্ন দেখছি না ত!

দু'একটি পাল তোলা নৌকা রাজহংসের মত জল কেটে কেটে সাঁতার দিচ্ছে। শুভ্র সিগালের দল জলের ধারে পাথরের উপরে প্রতীক্ষমান।

আকাশের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে,—আর বসে কি হবে! সবাই গাড়ীতে ফিরে গেলাম। গাড়ী আবার রেডিসনইনের দিকে এগিয়ে চল্ল। নগরীর আলোকোজ্জ্বল সরণী পার হয়ে মোটেলে যখন ফিরলাম তখন রাত সাড়ে ন'টা।

মাতা ও কন্যার তৎপরতায় দৌহিত্রটির এবং অতঃপর আমাদের সকলের নৈশাহার শেষ হলে সবাই কম্বলের তলায় শুয়ে পড়লাম এবং নর্থ সোর ড্রাইভের অনুপম সৌন্দর্য্যের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।



নইনের ঘূর্ণমান রেস্তোরা থেকে লেকসুপিরিয়র
ও ডুলুথ বন্দর এবং নর্থসোর ড্রাইভ]

মেপল গ্রোভ,

মিনিয়াপোলিস্, ২২শে আগষ্ট

আজ ঘুম ভাঙ্গতেই মনে হল আজই মিনিয়াপোলিস ফিরে যাব আমরা। তার আগে এখানকার মুফতে প্রাতঃরাশ (Free break fast) খেয়ে রাতের উপোষটা ত ভাঙ্গি। বলে বটে ree break fast তবে ঠিক মুফতে নয়,—পয়সা ঠিকই ভাড়ার মধ্যে ধ আছে।

প্রাতঃকালীন চা টা কল্যাই হিটারে তৈরী করে য়েছিল। যথা-কালে স্নানাদি শেষ করে তৈরী হয়ে সবাই মোটেলের ুফতের নাস্তা' খেতে চল্লাম।

এ বাড়ীটা আসলে ১৮ না ২০ তল, হলফ করে বলতে পারব না। এটার সর্বোচ্চ তলায় গোলাকার ঘূর্ণমান রেস্তোরাঁ। লিফটে চড়ে সেখানে পৌঁছে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। চারদিকের কাঁচের মস্ত মস্ত জানালা, —তার ভিতর দিয়ে সমগ্র ডুলুথ বন্দর, লেক সুপিরিয়র পাহাড়, বনানী, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ডুলুথ শহরের নবারুণরাগে উদ্ভাসিত সৌধ শ্রেণী, —সব কিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

দৌহিত্র পুঙ্গবকে নিয়ে আমরা পাঁচ জন একটা টেবিল অধিকার করে বসলাম। এখানে বসে প্রাতঃরাশ করতে করতে ধীরে সুস্থে নানা কোন থেকে ডুলুথ শহর, বন্দর ও হ্রদের দৃশ্যাবলী উপভোগ এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা।

নবারুণরাগে সজ্জিত লেক সুপিরিয়ারের বুকে রঙ্গিন পাল তোলা নৌকার ভিড়। এরিয়েল লিফট ব্রিজের তলা দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে— মিনোসোটা পয়েন্টের ঘর বাড়ী গাছপালাতে আলোর ছোপ,—অপ- দৃশ্য।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম—আর এক রূপ। কখন যে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল বুঝতেই পারলাম না,—এত মন্দগতিতে রেস্তোরাঁ ঘুরছে যে আমরা আদৌ টের পাচ্ছি না। এখন চোখের সামনে এক ফালি হ্রদ রৌদ্রালোকে ঝিকমিক করছে। তার তীরে বনাকীর্ণ পাহাড়ের গায়ে শুভ্র সৌধশ্রেণী সূর্য্যালোকে শুভ্রতর প্রতিভাত হচ্ছে। তার পেছনে—নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের বিচিত্র আলপনা; সব মিলে একখানা অনবদ্য ছবি।

আরো কিছুক্ষণ পর দেখলাম—সুপিরিয়র লেক পলাতক;—ধূসর রক্তিম প্রস্তরময় পাহাড়ের গায়ে গায়ে ডুলুথ শহর কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে; পাইন পপলার বার্চ্চের হরিৎ লাবণ্যে সে অপরূপ রূপসী। পাহাড়ের চূড়ায় কিন্তু নগরীর অধিকার নেই; সেখানে নীল আকাশে মাথা তুলে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে—পপলার, পাইন, ওক, সিডার প্রভৃতি তরুশ্রেণী; কোনো মানবসৃষ্ট সৌধের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

এমন চিত্র-নিভ নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী ছেড়ে যেতে মন কি চায়! তবুও যেতে হয়; এবং হয় নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে। হোটেলের একটা টেবিল আর কতক্ষণ দখল করে রাখা যায়!

মোটেলে ফিরে গিয়ে সবাই শেষ বারের মত প্রস্তুত হয়ে নিলাম। মালপত্র গাড়ীতে তুলে নিয়ে মোটেল ছেড়ে দেওয়া হল।

আমরা এবার শেষ বারের মত নর্থ সোর ড্রাইভ দেখতে যাচ্ছি।

নর্থ সোরের স্বপ্নসরণী বেয়ে গাড়ী চলছে আর আমরা বিস্ফারিত নয়নে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। রাস্তার এক দিকে পাহাড়ের সারি, গায়ে নীলাভ সবুজ অরণ্যানী, তারই মাঝে মাঝে ছবির মত সাজান ছোট ছোট কাঠের বাড়ী ঘর, দোকান পাট;—অন্যদিকে সূর্য্য করোজ্জ্বল হ্রদের জল, তীরে তীরে সবুজ প্যাগোডার মত পাইনের সারি আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

'ফ্রেঞ্চ রিভার' এর কাছে যখন এলাম মনে হল, আর কেন? এই খানেই থেকে যাই। ফেরার পথে নামবার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চল্লাম।

পথে পড়ল 'টেলার্স কেবিন' এর বিরাট বিজ্ঞাপন ; পাশে দুটি কাঠের ঘোড়ার মূর্তি দাঁড় করান। কী আছে এখানে! নেমে দেখবার একটা দুর্বার কৌতূহল সত্বেও গাড়ীকে এগিয়ে যেতেই হচ্ছে ; সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা ছুটে চলেনি যে। যা দেখার দেখে নিয়ে আজ বিকেলের মধ্যেই মিনিয়াপোলিসে ফিরে যেতে হবে। ফেরার সময় একটুখানি সময় করে নিশ্চয়ই দেখব এই সান্ত্বনা নিজেকে বারে বারেই দিচ্ছি আর বাইরে চোখ মেলে বসে আছি 'রম্যাণি বীক্ষ্যায়'।

পাহাড়, অরণ্য আর হ্রদ—এই তিনে মিলে রাস্তার দু'পাশে নীল আকাশের পটভূমিতে ক্ষণে ক্ষণে কতই না নব নব রূপের সৃষ্টি করে চলেছে!

আর রাস্তার দু'পাশে—পাহাড়ের গায়ে গায়ে অসংখ্য সাদা হলদে বেগুনী ঘাসের ফুলের এই যে রং এর বাহার—এটাই কি কম!

প্রকৃতির রূপসুধা পান করতে করতে এক সময় 'টু হারবার'-এ পৌঁছে গেলাম। লৌহ আকর আবিষ্কারের প্রথম যুগে এ শহরের খ্যাতি যথেষ্টই ছিল;—এ কথা ইতিহাস বলে বটে, তবে বর্তমানে এটি একটি ভ্রষ্টখ্যাতি স্মৃতিভার জর্জ্জরিত শহর মাত্র, দুটি কেন একটি হারবারও এখানে নেই ; হারবার হারিয়ে গেছে, দেখতে সময় সামান্যই লাগল।

এবার ফেরার পালা। প্রত্যাবর্তন করছি পুরাণো পথেই। থেকে থেকে চায়ের তেষ্টা পাওয়া আমার একটা বিশ্রী অভ্যাস। তাই রাস্তার পাশের একটা ছোট খাট ছিমছাম রেস্তোরাঁ দেখে সবাই ঢুকে পড়লাম। চা, কফি, ও সামান্য কিছু খাদ্যের অর্ডার দিয়ে মাতা ও কন্যা দৌহিত্র সহ ভিতরে ঢুকে গেল। ছোট হোক আর বড় হোক—রেস্তোরাঁতেই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম ও নোংরা ফেলার জায়গা থাকবেই। দোকানের আমেরিকান মহিলারা খুব আলাপী আর শিশু-প্রিয়। তাঁরা বাচ্চাটিকে খুব আদর করলেন এবং মেয়েদের সঙ্গে খুব গল্প করলেন। গৃহিনী ত এঁদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ। এঁরা বড়লোক নন, দোকানটিও ছোট। কিন্তু ছোট হলেও কী

সুন্দর ব্যবস্থা। কী ঝকঝকে বাড়ী ঘর, আর ছিমছাম জিনিষ পত্র সাজান। কথাবার্তাও খুব ভদ্র। এ রেস্তোরাঁর ঠিক পেছনেই পাহাড় ও বন, সামনে লেক সুপিরিয়রের বিস্তীর্ণ জলরাশি; পাড়ে বেশ কয়েকটি পপলার আর পাইন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, —অপূর্ব দৃশ্য। মুগ্ধ পিন্টু ত একটা ছবিই তুলে নিল। ইত্যবসরে আমি একটি আমেরিকান ছেলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এখানকার জঙ্গলের গাছ পালার নাম ধাম যথাসম্ভব জেনে নিলাম।

চা পানের পর সবাই গাড়ীতে চেপে বসলাম। এবার গন্তব্য স্থল 'টেলার্স কেবিন'। ভেবেছিলাম বুঝি বড় রাস্তা ছেড়ে অনেকটা ভিতরে যেতে হবে। কিন্তু তা হল না, রাস্তা থেকে দুই তিন শ গজের মধ্যেই গাছের ঝোপের আড়ালে এই লগ কেবিনটি। বাইরে পাইন গাছের সারি, তার নীচে কয়েকটি জীর্ণ ঘোড়ার গাড়ী, গাড়ীর চাকা, জিন, লাগাম ও অন্যান্য পুরানো অংশ। আর ছিল দুটি কাঠের ঘোড়া, যেন জীবন্ত। তার পাশেই একটা মজার সাইনবোর্ড, তাতে লেখা— "দয়া করে আমাদের উপর চড়ো না"। সামনেই একটা লগ কেবিন। ভিতরে ঢুকে দেখলাম—বেশ কিছু দর্শনার্থী সেখানে ভিড় করেছেন। স্থানীয় নানা জিনিষপত্র জীব জন্তুর হাড়, শিং, রেড ইণ্ডিয়ানদের তৈরী নানা জিনিষ পত্র, হাতিয়ার, যন্ত্র পাতি, পুতুল, হাঁড়ি, বাসন পত্র, fur অর্থাৎ লোমশ পশুর নরম দীর্ঘ লোমওয়ালা চামড়া, নানা রকমের রঙ্গিন পাথর ও ছবি এখানে আছে। আমরা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সামান্য কিছু কিনলাম। ছোট দোকান, সংগ্রহও সামান্য কিন্তু আন্তরিকতার কমতি নেই। এখানকার আমেরিকান দোকানদারটি একদা কোলকাতায় ছিলেন। গৃহিনীর কন্যার শাড়ীপরা দেখেই আমাদের বাঙ্গালী বলে চিনতে পারলেন এবং যেচে আলাপ করলেন। আনন্দ পেলাম।

কেনা কাটা শেষ হলে আবার সবাই গাড়ীতে চড়ে বসলাম। ঠিক হল এবার ফ্রেঞ্চ রিভারের কাছে নেমে কিছুক্ষণ হ্রদের পাশে বসা হবে।

যথা সময়ে গাড়ী ফ্রেঞ্চ রিভারে এসে পৌঁছালে আমরা সবাই নেমে পড়লাম। বড় সুন্দর এ জায়গাটা। একটা রাস্তা ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে হ্রদে এসে মিশেছে। এ রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে এবার ইতস্ততঃ ভ্রমণের পালা। কেউ গিয়ে বসলেন জলের ধারে পাথরের চাঁইএর উপর জলে পা ডুবিয়ে,—কেউ বা উঁচু পাহাড়ের উপর পাইন বনের ভিতর ঢুকে বল্লেন—"এখানে" হারিয়ে যেতে নেই মানা"।

"নিশ্চয়ই আছে"—উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে গৃহিনী বল্লেন—"শীঘ্র নেমে এস"। কেউ বা নির্ভয়ে ছুটলেন ঘাসের বনে ফুল কুড়াতে। আমি চুপি চুপি চলে এলাম পুলের নীচ দিয়ে ফ্রেঞ্চ রিভারের পাশে—যেখানে তার ক্ষীণ ধারাটি পাথরের উপর ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে।

মৎস্য শিকারীদের কেউ কেউ হ্রদের জলে ছিপ ফেলে বসে আছেন দেখতে পেলাম। এখানে দুইজন আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কর্ম্মজীবনের শেষে এই শান্ত নির্জ্জন পরিবেশে শেষ জীবন কাটাতে এসেছেন। মৎস্য সম্বন্ধে একটা নেশাও এঁদের রয়েছে, তবে সেটা মাছ ধরার নয়, ধরা মাছকে বাঁচাবার। কেউ যেন অথবা মাছ ধরে 'অবোলা প্রাণী' হত্যা না করে—এই প্রচেষ্টাই এঁদের নেশা। মৎস্য শিকারী দেখলেই আলাপ জমিয়ে নিয়ে ক্রমে ক্রমে বোঝাতে চেষ্টা করেন—অকারণ প্রাণী হত্যা ঠিক নয়। তবুও যদি কেউ মাছ ধরতে চান যেন জীবন্ত টোপ ব্যবহার না করেন,—কারণ সে টোপের লোভ সম্বরণ করা অবোধ মাছদের পক্ষে অসাধ্য। আর যদি তবুও বড়শিতে গেঁথেই যায়—যেন তক্ষুণি ছেড়ে দেওয়া হয়।

কত বিচিত্রই না মানুষের জীবকল্যাণ সম্বন্ধে ধারণা, পন্থা ও পদ্ধতি। তা হোক—তবুও রাজনীতি থেকে এ ত ঢের ভাল।

রৌদ্রের তেজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সুতরাং এক সময় এই শখের বিলাসিতা পরিত্যাগ করে গাড়ীতে ফিরে যাওয়া হল। এবার গাড়ী 'গ্লেনসিন' নামক দর্শনীয় ভবনটির দিকে চল্ল। পৌঁছে দেখি গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী রাখার স্থান পাওয়াই দুষ্কর। অনেক চেষ্টার পর জায়গা

যদিও বা মিলল—টিকিট মিলল না। বাড়ীটি দেখতে হলে নাকি কম-পক্ষে আরও দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।

খানকয় কাঠের আসবাবপত্র আর কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন দেখতে বেশ কিছু ডলার গলার 'কলার' ধরে নিয়ে নেবে এবং সময়ও নষ্ট হবে এত-খানি,—এতে আমি রাজী নই। বল্লাম—"যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর, মহীশূর—অনেক রাজবাড়ীই ত ভাল করে দেখা হয়েছে, 'গ্রেনসিন' না দেখলে এমন কিছু 'Sin' হবে না।

সকলেরই দেখলাম—একই মত। সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট না করে সবাই গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। তাছাড়া-না নাগাল পেলে আঙ্গুর ফল ত সর্বদাই টক।

শেষবারের মত নর্থ সোর ড্রাইভের স্বপ্নরূপসী পার হয়ে এলাম। এবার গাড়ী চালাচ্ছে মিতা। চোখের সামনে লেক সুপিরিয়র বা নর্থ সোর ড্রাইভ আর নেই, রইল এদের অপরূপ রূপের সুখস্মৃতি মনের মন্দিরে অক্ষয় হয়ে।

উড়াল পুলের জাল ছিঁড়ে গাড়ী ডুলুথ শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে। নাতি কোলে বৃদ্ধ পেছনের সিটে হেলান দিয়ে দু'পাশের দৃশ্য উপভোগ করে চলেছি। হ্রদ এখন অদৃশ্য, চোখের সামনে ছোট, বড়, মাঝারি পাহাড়ে বনে আর ঢালু জমিতে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে হিল্লোলিত বনকুসুম সম্ভার। পাহাড়ের গায়ে গায়ে মাথায় মাথায়, মন্দিরের চূড়ার মত পাইনের সারি,—কী অপরূপ মাধুরী!

যে রাস্তায় ডুলুথ গিয়েছিলাম—ঘরে ফিরছি সেই একই রাস্তায়। সে বর্ণনা রেখে বরং 'মুজলেক' বেড়িয়ে আসা যাক।

দু'পাশের পাইনের অরণ্য, পুষ্পিত প্রেইরী প্রান্তর এবং মাঝে মাঝে ক্ষীণধারা স্রোতস্বিনী পার হতে হতে এক সময় চোখে পড়ল—রাস্তার পাশে একটা সাইন বোর্ড, তাতে লেখা—'মুজলেক এই দিকে।" পিণ্টু বল্ল—"কিছু সময় হাতে যখন রয়েছে—মুজলেকটা দেখেই আসা যাক।"

অতঃপর মিতার গাড়ী পাকা রাস্তা পরিত্যাগ করে মুজলেকগামী

খোয়া বাঁধান রাস্তায় নেমে পড়ল। রাস্তার নির্দেশ দেখে দেখে কিছু সময়ের মধ্যেই মুজলেকে এসে মিতা গাড়ী দাঁড় করাল।

সহসা এক বৃদ্ধ আমেরিকান ভদ্রলোক নিকটস্থ একটা ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সহাস্য বদনে পিন্টুকে মুজলেকে মাছ ধরার সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন।'

'একেত নাচইস্যা পুরী,

তাতে আবার ঢোলের বাড়ি।" অর্থাৎ কিনা মেয়ে (পুত্রী—পুরী) এমনিতেই নৃত্যানুরাগিনী, তাতে আবার ঢোলের সঙ্গত।

পিন্টুর এমনি মাছ ধরার প্রচণ্ড শখ, তার উপর মাছ ধরায় নিমন্ত্রণ। তার পক্ষে এ লোভ সামলান কঠিন। অতএব কড়কড়ে দশ ডলারের বিনিময়ে মিনেসোটা রাজ্যে যত্রতত্র মাছ ধরার অবাধ অধিকার অর্জন করে পিন্টু হাসি মুখে ফিরে এল।

জঙ্গলে সর্বত্র লম্বা লম্ব, ঘাস,—তাতে ফুল ফুটে আছে। টিলার গায়ে আর ঢেউ খেলান জমিতে পাইন, পপলার, সিডার মেপল আরও কত কি স্থানীয় গাছপালা। কাঁকরের রাস্তা বেয়ে গাড়ী এসে একেবারে হ্রদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দ্রুত হস্তে গাড়ীর পেছন থেকে মাছ ধরার সাজ সরঞ্জাম বের করে নিয়ে পিন্টু হ্রদের পাড়ে মাছ ধরার জন্য তৈরী কাঠের পাটাতনে গিয়ে অধিষ্ঠিত হল। মিতা ও গৃহিনী বাচ্চা সহ রইলেন গাড়ীতে আর গড়াতে গড়াতে আমি চল্লাম ভোজ্য পানীয় সহ অদূরবর্ত্তী বিশ্রাম স্থানের উদ্দেশে।

কয়েকটা পাইন গাছ জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচে দুটি লম্বা বেঞ্চ ও একটি টেবিল পাতা; চতুর্দিকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে তাদের রং ও গঠন। এটাই হল এখানকার 'বিশ্রাম স্থান'। একটু দূরে ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা আলাদা শৌচাগার। একটু দূরে ময়লা ফেলার ড্রাম। হ্রদের ধারে কাঠের পাটাতন,—অনেকটা আমাদের দেশের গ্রাম্য পুকুর ঘাটের মতই জলের মধ্যে অনেকটা ঢুকে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরার খুব সুবিধা। নিকটেই

একটা টেবিল পাতা,—পাশে আঁশ ফেলার জায়গা আর টেবিলের উপর আঁশ ছাড়াবার একটি যন্ত্র। ছিল ত সবই, ছিল না কেবল পিণ্টুর ভাগ্য। সে দিন পিণ্টুর বড়শিতে একটা মাছও ঠুকরাল না। ঘণ্টাখানেক বৃথা চেষ্টার পর পিণ্টু ফিরে এল। মাছ না পেলেও তার দুঃখ নেই. ধরার চেষ্টাতেই তার আনন্দ।

এই এক ঘণ্টা সময় সব চেয়ে ভাল কেটেছে আমার শিশু দৌহিত্র-টির। জলের ধারে দৌড়াদৌড়ি করে, ঘাসের বনে ফুল ছিঁড়ে, রাস্তায় কাঁকর কুড়িয়ে, সর্বক্ষণ হৈ হৈ করে। অক্লান্ত থেকে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারে এ জগতে একমাত্র শিশুরাই।

তবে আমরাও একেবারে বঞ্চিত হই নি। আমেরিকার এক গণ্ড-গ্রামে জনহীন এক হ্রদের পাড়ে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পাইন গাছের ছায়ায় পাইন গাছ চেরা অমসৃণ বেঞ্চে বসে চা. কফি ও কুকি অর্থাৎ বিস্কুট খাওয়ার অভিজ্ঞতা এমন কিছু ফেলনা নয়: চার পাশের পরিবেশও ছিল অকৃত্রিম গ্রাম্য। সদাপ্রসাধিতা নগরী চটক ছিল না বটে, ছিল প্রসাধন বিহীনা গ্রাম্য মেয়ের সহজ লাবণ্য—তার টিয়া সবুজ টিলার গায়ের ঘাসে ঘাসে, হাওয়ায় দোলা থোকা থোকা রঙ্গিন ঘাসের ফুলে,—টিলার মাথায় মাথায় পপলার, সিডার বার্চ্চ আর পাইনের জঙ্গলে, হ্রদের ছায়াঘন নিস্তরঙ্গ জলে আর জলজ ঘাসের বনে উড়ন্ত ফড়িং এর রঙ্গিন পাখায়।

মৌজ করে মুজহ্রদ দর্শনান্তে আমরা এবার ঘরে ফিরে চলেছি। মিতা গাড়ী চালাচ্ছে—পিণ্টু পথ নির্দ্দেশক আর দর্শক আমরা; এদেশের গ্রামগঞ্জ, মাঠ ঘাট, পাহাড়, গাছপালা দেখতে দেখতে চলেছি। সন্ধ্যার আগেই দেখলাম বাড়ীর দরজায় পৌছে গেছি।

ভাবছি—ভাগ্যিস শৈলনগরী ডুলুথ, সুপিরিয়র হ্রদ বিশেষতঃ নর্থসোরড্রাইভ দেখা হয়ে গেল! নইলে এত দেখেও আমাদের আমেরিকা দর্শন পূর্ণ হত কি।



[সেণ্ট ক্রয়নদী টেইলারস্ ফলস্]

মেপল গ্রোভ, মিনিয়াপোলিস।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ ইং

ভেবেছিলাম—আমেরিকা ও ক্যানেডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগ এবারকার মত বুঝি শেষ হল। কিন্তু শ্রীমার ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। সে কথাতেই আসছি।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ক্যানেডা থেকে কনিষ্ঠ শ্যালক চাঁদু সপরিবারে এখানে তার ভাগ্নীর বাড়ী বেড়াতে এল। দু'চার দিন পর এক ছুটির দিনে পিণ্টু বল্‌ল—"আজ লেবার ডে"—ছুটির দিন। কাছে পিঠে কোথাও বেড়িয়ে আসলে হয় না? মিনেসোটা আর উইস্‌কনসিনের সীমানায় সেণ্টক্রয় নদীর পাড়ে ঘুরে আসা যাক। সে জায়গাটা শুনেছি খুব সুন্দর; চাঁদু মামার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।"

কারোই আপত্তি করার কিছু নেই এতে। দুপুরের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়ে গাড়ীতে চেপে বসলাম। আজ গাড়ী চালাচ্ছে পিণ্টু, মাঝখানে আমি আর জানালার পাশে চাঁদু। পেছনের সিটে—দুই জানালায় দুই শিশু কোলে দুই জননী রাণু ও মিতা আর মাঝখানে গৃহিনী। দুই শিশু সঙ্গে, তাই খাদ্য পানীয় সঙ্গে যথেষ্ট নেওয়া হল।

ডুলুথগামী রাস্তায় আমরা চলছিলাম; হঠাৎ গাড়ী ডানদিকে মোড় নিল। এ রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট রঙ্গিন ঘরবাড়ী সম্বলিত ছবির মত সুন্দর সুন্দর জনপদ চোখে পড়ছে। দেখে ত চাঁদু মুগ্ধ। বল্‌ল—"এসব দেখে মনে হচ্ছে—যেন ইয়োরোপের ছোট ছোট শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। সেখানেই ঠিক এই রকমের বাড়ী ঘর দোকান পাট। আর কী সুন্দর সাজানো। প্রাকৃতিক পরিবেশকে তারা এতটুকু নষ্ট করে নি, যথাসম্ভব অবিকৃত রেখেছে। তাই এত সুন্দর।"

শুনে পিণ্টু বলল—"তার কারণ এখানে যারা থাকে তারা ত নরওয়ে সুইডেন বা জার্মানী থেকেই এসেছে।"

এখানকার গ্রামে গঞ্জে কেমন একটা আলসেমি ভরা ছায়াচ্ছন্ন সবুজ মায়া জড়ান। বেশ কয়েকটি জনপদ পেরিয়ে আমরা এবার পাহাড়ী এলাকা দিয়ে চলেছি। ছোট ছোট পাথরের টিলা,—তার মাঝখান দিয়ে পাথর কাটা রাস্তা তৈরী হয়েছে, জায়গায় জায়গায় সাবধান বাণী—"গড়িয়ে পড়া পাথর থেকে সাবধান"।

অর্থাৎ উপর থেকে পাথর খসে মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়তেও পারে তাহলে।

ভীতিপ্রদ বটে, তবুও কী সুন্দর ঘন সবুজ এই পরিবেশ! বৃক্ষশ্রেণী রাস্তা থেকেই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে যেখানে আকাশের ঘননীল আর মেঘের শুভ্রতা।

নদীর বুকে যন্ত্রচালিত, পালচালিত, পালবিহীন রকমারি নৌকার স্বচ্ছন্দ বিহার চলছে। দু'চার জন উৎসাহী যুবক নদীর বুকে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড়ের উপর বসে মাছ ধরছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা লেনদেন এখানে সর্বক্ষণ। সামাজিক জীব আমরা, একটুতেই মানুষের সঙ্গ ছাড়া হাঁকিয়ে উঠি। তবুও একথা ত মিথ্যে নয় যে প্রকৃতির শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে হলে সে সৌন্দর্য্য খুঁজতে হবে নির্জ্জনে একান্তে।

পাহাড়ী রাস্তার একটা বাঁকে এসে পিন্টু গাড়ী দাঁড় করাল। চারদিকে চোখ মিলে তাকিয়ে এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও আমরা একেবারে 'Moon struck'—পাগল দিশাহারা। কী অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য!

দক্ষিণ-বাহিনী সেন্ট ক্রয় নদীটি এখানে শ্লথগামিনী, তার তন্বীনিভ ক্ষীণ কটি এখানে বিপুলা প্রৌঢ়া উইসকনসিন দুহিতাদের মত! নদীর বুকে ছোট মাঝারি অনেক দ্বীপ; তাদের তরঙ্গাঘাতভগ্ন তটভূমিতে ঢেউ-এর মাথায় মাথায় সাদা ফেনা, আর শীর্ষদেশে নীল আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পাইন বনানী চিরহরিৎ লাবণ্য। এটি ক্যানেডার সেন্ট লরেন্স নদীর বুকে সহস্রদ্বীপ'-এর ছোট সংস্করণ যেন। দক্ষিণ আকাশের দিকে চাইলে মনে হয়—যেন ছবি দেখছি। উপরে ঘননীল আকাশে

শুভ্রমেঘের পুঞ্জ, নীচে নদীর নীল জলধারা,—তার বুকে অজস্র দ্বীপ ; তাতে চিরহরিৎ পাইনবনানী শীর্ষ সবুজ প্যাগোডার মত আকাশের পটে আঁকা। দুই তীরের সবুজ পাহাড়ের সারি যেন ঢেউ এর পর ঢেউ তুলে নীল আকাশকে স্পর্শ করতে ছুটেছে! এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে যেতে কি প্রাণ চায়!

তবু যেতে হয়। ঘড়ি ঘড়ি তাড়া দেয় বলে এ যুগে সব কিছুই তড়িঘড়ি করতে হয়। দু'দণ্ড নির্ভেজাল আলসেমি করে পদ্মভুক (lotas eater) এর অভিনয় করার জো নেই। তাই বাচ্চা নিয়ে সবাই আবার গাড়ীতে চড়ে বসল। কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল— দু'চার জন কৃষক আনাজ তরকারী নিয়ে পথের ধারে বসে আছে। তাদের কাছ থেকে শুনা গেল এ অঞ্চলে টেলারের প্রপাত (Taylor's falls) নাকি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

পথের সন্ধান সংগ্রহ করে গাড়ীত ছুটে চল্ল, কিন্তু পথ আর ফুরাতে চায় না। অবশেষে বহুদূরে গিয়ে যখত জায়গাটাতে পৌঁছান গেল— তখন জানা গেল—এখানে প্রপাত টপাত কিছু নেই। তাহলে Taylor's falls নয়—Taylor's false ! নিতান্তই বাজে রসিকতা।

কিন্তু এখানে অজস্র গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে কেন? দ্রষ্টব্য তাহলে নিশ্চয়ই কিছু আছে। নেমেই দেখা যাক না। গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে দেখি—সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট মাঠ ; তাতে অজস্র গাছ, বাগানের মত সাজান, বহু ওক, পাইন, সিডার, মেপল আর পপলারের সবুজ অন্ধকার। মাঝে মাঝে বসবার জন্য পাইন গাছ চেরা কাঠে তৈরী বেঞ্চ ও টেবিল, চারপাশের রং-এর সঙ্গে রং মিলিয়ে সবুজ রং করা। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের মাঝে মাঝে লোহার উনুন, চড়ুইভাতি প্রেমিকরা যাতে সহজে সগুঝলসিত মাংস রুটীসহ উপভোগ করতে পারেন। অদূরে সেণ্টক্রয় নদীর নীল জলধারা, পরপারে উইসকনসিন। সেখানেও এমনি সাজান বাগান,—সারি সারি সবুজ বেঞ্চ আর টেবিল। দেখতে পাচ্ছি সেখানেও এখানকারমত দর্শনার্থীর ভিড়।

একট বৃদ্ধ ওক গাছের নীচে পিণ্টু ও চাঁছু একটি টেবিল ও দুটি বেঞ্চ বয়ে নিয়ে এল। মহিলারা ক্ষিপ্রহস্তে টেবিলে খাবার দাবার সাজিয়ে সকলকে পরিবেশন করলেন এবং দুটি বাচ্চাকে কিছু খাওয়াতে গিয়ে দুই মা হিমসিম খেতে লাগলেন। ওদের খাওয়া ত মাথায় থাকল,—দুই শিশু কোন সুযোগে পিণ্টুর ছিপের দুই অংশ দখল করে নিয়ে খেলায় মত্ত :—বেচারা পিণ্টুর এবারও মাছ ধরা হল না।

চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি আর এখানকার নদীর বুকে নৌকা-বিহারের ঢালাও ব্যবস্থা লক্ষ্য করছি। নৌবিহাররত দুটি ভারতীয় পরিবার নয়ন গোচর হল। তাঁরাও আমাদের দেখতে পেয়েছেন ও ভারতীয় বলে চিনতে পেরেছেন মনে হল। চিনতে অসুবিধার কথাও নয়,—গাত্রবর্ণ ও পরিহিত শাড়ীতে ভারতীয় বলে সনাক্ত করা ত সহজ। নদী বক্ষ থেকে স্মিতহাস্যে হাত নেড়ে জানালেন যে 'দেশওয়ালী' বলে আমাদের মেয়েদের ওঁরা চিনতে পেরেছেন।

দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল ;—সঙ্গে দুটি বাচ্চা, পথও অনেকটা। পথ বিজন তিমির সঘন 'কানন কণ্টক তরুগহন' এবং 'আঁধার ধরণী' ত হতেই পারে। তাই পিণ্টু ফিরবার কথা উত্থাপন করতেই সবাই উঠে দাঁড়ালাম এবং সেণ্টক্রয় নদীকে শেষ বারের মত বিদায় জানিয়ে মাল পত্র সহ গাড়ীতে গিয়ে বসলাম।

এবার অন্য রাস্তায় আমরা ফিরছি। ক্ষেত-খামার তৃণভূমি আর নীল জলে আলোর ঝিলিক দেখতে দেখতে মিনিসিপি নদীর কূল পেরিয়ে এক সময় মেণ্টলগ্রোভের বাড়ীর দরজায় পৌছে যেতে চাঁছু পিণ্টুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্ল "খুব সুন্দর জায়গা দেখিয়ে আনলে, তোমার স্থান নির্বাচনের সুখ্যাতি করতেই হয়।" সবাই এক বাক্যে সায় দিয়ে বল্লাম—"হাতের কাছে এত সুন্দর জায়গা ছিল অথচ এতদিন দেখা হয়নি। ভাগ্যে আজ দেখালে ; না হলে আমেরিকা দর্শন সম্পূর্ণই হত না।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার কিন্তু 'আমার কথাটি' সত্যই ফুরাল,—নটের গাছের যা হবার হবে,—বর্ষা পেলে আবার ঝাঁকড়া হয়ে উঠবে 'খন'। ইতি,

তোমাদের